নামিকো

নামিকো

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

'নামিকো' বাহির হইল—রুদ্র বৈশাখের খরতাপে চরাচর যখন অবসন্ন মূর্চ্ছিত। নামি সারাজীবন যে জ্বালায় পুড়িয়াছিল তাহাও বৈশাখের দাহের ন্যায়ই নিদারুণ।

কবিকল্পনা 'নামিকো'র ভিত্তি নয়—সুবিখ্যাত জাপানী যোদ্ধা মার্শ্যাল প্রিন্স্ ওয়ামার কন্যার জীবনের করুণ কাহিনী অবলম্বনে কেন্‌জিরো তোকুতোমি মূল জাপানী উপন্যাসখানি রচনা করেন। তাহারই ইংরেজি অনুবাদ হইতে ভাষান্তরিত হইল।

প্রাচীনে ও নবীনে, তরুণে ও প্রবীণে সংঘর্ষ দেশে দেশে সকল জাতির মধ্যেই অল্প বিস্তর বিদ্যমান, জাপানেও অন্যথা নয়।

বন্ধুবর সুলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইখানির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখিয়াছেন। প্রচ্ছদপটের ছবিখানি প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের আঁকা। আমার পত্নীও এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি ঋণী।

কলিকাতা,
১০ বৈশাখ ১৩২২

শ্রীমতী কাননকুমারী

প্রিয়তমাসু

নামিকো

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মধুবাসর

গোধূলির ম্লানিমা ইকাও সহরের উপর ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। চিডিরা হোটেলের ত্রিতলের বাতায়নে এক তরুণী দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতেছিল। তাহার বয়স প্রায় অষ্টাদশ হইবে; মস্তকে তাহার সুন্দর কবরী ও পরণে ধূসর রঙের ক্রেপের বসন, হরিৎবর্ণের ফিতা দিয়া বক্ষদেশে বদ্ধ।

সে গৌরবর্ণা। তাহার চোখের ভ্রূ-দুইটি কিছু বেশী কাছাকাছি এবং চিবুকটি কথঞ্চিৎ সূক্ষ্ম, তথাপি তাহার তনুলতা যেমন তন্বী তাহার স্বভাবও যে তেমনি ধীরনম্র তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইবে না। শীতল উত্তরে-বাতাসকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রস্ফুটিত প্লাম ফুলের মত সে

ছিল না; বসন্তপ্রভাতে যাহার পাপড়ি বায়ুভরে প্রজাপতির মত যত্র-তত্র ছড়াইয়া পড়ে, সেই 'সাকুরা'র মতও সে ছিল না। সে ছিল সেই লজ্জিতা দীনাক্ষীর মত, গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার অন্ধকারের আবরণে যে আত্ম-প্রকাশ করে।

সেই বসন্তের সন্ধ্যায় দূরবর্ত্তী নিক্কো ও আশিও এবং এচিঙো-প্রদেশের সীমান্তবর্ত্তী ও নিকটস্থ ওনোকো, কোমোচি ও আকাগির পাহাড়গুলি অস্তগামী সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আকাগির পশ্চাৎ হইতে দুইখানা মেঘ ভাসিয়া উঠিল। নিম্নের বৃক্ষ হইতে এক দল কাক কা কা রবে উড়িয়া গেল। তাহাদের কা কা শব্দেও যেন সোনা মাখান ছিল!

তুলার মত দুইখানা মেঘ—তাহাদের দুই হাতে যেন জড়াইয়া ধরা যায়—পর্ব্বতচূড়ার উপর বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া অসীম শূন্যের মধ্য দিয়া দুইটি সুবর্ণময় প্রজাপতির মত ঝক্‌মক্ করিতে করিতে আশিও অভিমুখে উড়িয়া গেল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ধূসর সন্ধ্যায় শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। মেঘ দুইখানির বর্ণ বেগুনে হইয়া উঠিল। বায়ুবেগে তাহারা একের পৃষ্ঠে অন্যে আরোহণ করিল, তারপর পৃথক-ভাবে তিমিরমাখা আকাশে ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই নিম্নের মেঘখানি ক্রমশ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল, এবং অবশেষে অগোচরে কখন অদৃশ্য হইয়া গেল। অবশিষ্ট মেঘখানি নিরানন্দ ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়া উদ্দেশ্যহীনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অবিলম্বে আকাশ ও পাহাড়গুলি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ত্রিতলের বাতায়নে দণ্ডায়মানা তরুণীর মুখ অন্ধকারে মলিন দেখাইতে লাগিল।

"দিদিমণি—হ'ল কি আমার—এমন ভোলা মন!" ইকু হাসিতে

হাসিতে কহিল, "আমার বলা উচিত ঠাকরুণ। এই ফিরছি। কী অন্ধকার! নামি ঠাকরুণ কোথায় তুমি?"

"এই যে।"

"ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এস এস শীগ্‌গির ভেতরে এস, ঠাণ্ডা লাগবে যে! কর্ত্তা এখনো ফেরেন নি না কি?"

"কি যে করছেন কে জানে," এই বলিয়া রমণী কক্ষে প্রবেশ করিল। "কা'কেও তাঁর সন্ধানে পাঠিয়ে দাও।"

"যে আজ্ঞে", বলিয়া বৃদ্ধা ইকু অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া একটি দিয়াশালাই বাহির করিয়া আলো জ্বালিল।

ঠিক সেই সময় হোটেলের পরিচারিকার সিঁড়িতে উঠিবার পদশব্দ শোনা গেল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে ইকুর হাতে একখানি পত্র দিল।

ইকু কহিল, "ধন্যবাদ। ব্যারনের আসতে বড় দেরী হচ্ছে, আমরা তাঁর খোঁজে লোক পাঠিয়েছি। শীগগিরই এসে পৌঁছবেন এখন। এই নাও একখানা চিঠি", বলিয়া বৃদ্ধা নামিকো-র হাতে একখানি পত্র দিল।

"বাবার চিঠি দেখছি! তাকেও এত দেরী করছে কেন?" বলিয়া তরুণী পত্রখানি হাতে লইয়া পরিচিত হস্তাক্ষরের দিকে দেখিতে লাগিল।

ইকু জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কর্ত্তার চিঠি? খবর কি? নিশ্চয়ই তিনি কিছু মজার কথা লিখে থাকবেন!"

বৃদ্ধা দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটি পুলিন্দা আনিয়া ছোট একটি দেরাজে রাখিল; নামির দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, "কী শীত! তোকিওর চেয়ে কত বেশী!"

"তোমার সেটা আগেই জানা উচিত ছিল, কারণ এখানে মে মাসে 'সাকুরা' ফোটে। এস আরও কাছে এসে বস।"

ইকু নামির নিকট গিয়া বসিল।

তরুণীর মুখপানে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে চাহিয়া বৃদ্ধা কহিল, "আমার বিশ্বাসই হয় না যে যাকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি তুমিই সেই। তোমার মা যেদিন মারা গেলেন, তুমি আমার পিঠে উঠে মা বলে ডেকেছিলে, সে যেন কালকের কথা বলে মনে হচ্চে।" অশ্রুসিক্ত চোখে সে বলিতে লাগিল, "তোমার বিয়ের দিন আমার মনে হচ্ছিল, তোমাকে সেই সুন্দর পোশাকে দেখলে তোমার মা কত খুসী হতেন।"

ইকু চোখ মুছিল। নামি নতমস্তকে বসিয়া রহিল, পরিচারিকার দুঃখ তাহারও মনে আসিয়া আঘাত করিয়াছে। তাহার দক্ষিণ হস্ত আগুনের বাক্সের উপর স্থাপিত। সেই হস্তের অঙ্গুলিতে পরিহিত অঙ্গুরীয় ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল।

বৃদ্ধা মুখ তুলিল।

"আমায় মাপ কর, কি বলি তার ঠিক নেই, যতই বয়স হচ্চে ততই যেন আমার ভীমরতি ধরছে। দিদিমণি, না না ঠাকরুণ, ছেলেবেলায় তুমি কত কষ্টই না পেয়েছ! তুমি যে তার মধ্যেও বেঁচে ছিলে এইটেই আশ্চর্য্য! কিন্তু—এখন থেকে সবই ভালো হবে। এমন ভালো স্বামী পেয়েছ—"

সিঁড়ি হইতে ভৃত্য হাঁকিল, "ব্যারন প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন।" …… পরক্ষণেই একটি যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ওঃ বড় হাঁপিয়ে গেছি!"

তাহার বয়স প্রায় তেইশ বৎসর, সে ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত। খড়ের চটি খুলিয়া রাখিয়া হলের মধ্য দিয়া সে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরিচারিকাদিগকে ঈষৎ মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া সে পশ্চাদ্বর্ত্তী কাগজের লণ্ঠনধারী ছোকরাকে কহিল, "ধন্যবাদ। ফুলগুলো গরমজলে রাখ তো।"

স্বামীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নামি নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, ফুলগুলি দেখিয়া কহিল, "বাঃ! কি সুন্দর!"

ইকু কহিল, "খাসা ফুল! এগুলি পেলেন কোথায়?"

"সুন্দর বৈকি, খুব সুন্দর! এই দেখ একটা হলদে ফুল। কালকে নামি এগুলি সাজিয়ে রাখবে'খন। আপাতত এখন স্নান করা যাক।"

নামি ও বৃদ্ধা ঘরে ফিরিয়া গেল।

"আহা কর্ত্তা আমাদের কেমন আমুদে! জাহাজী লোকেরা সব এমনই হয়ে থাকেন! কেমন, নয় কি?"

নামি কোন উত্তর দিল না। তাহার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর ওভারকোটটি সযতনে বুরুশ দিয়া ঝাড়িয়া গোপনে একবার স্বীয় অধরে স্পর্শ করাইয়া আলনায় টাঙাইয়া রাখিল।

কয়েক মিনিট পরে সিঁড়িতে গুরু পদশব্দ শোনা গেল। শব্দ আসিয়া দ্বারের সম্মুখে থামিল। "আঃ—বেশ আরাম পাওয়া গেল," বলিয়া যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

ইকু কহিল, "খুব শীগ্‌গির স্নান সেরেছেন ত?"

"পুরুষ মানুষে শীগ্‌গিরই সারে," বলিয়া যুবক আনন্দে হাসিয়া উঠিল। পত্নীর সাহায্যে চওড়া-আঁজি-কাটা তুলা-ভরা 'কিমোনো' পরিয়া ধপ্ করিয়া আসনে বসিয়া পড়িল এবং উভয় হস্তে গণ্ডদেশ ঘষিতে লাগিল। তাহার মাথার চুল কদমফুলের কেশরের মত ছোট ও সমান করিয়া ছাঁটা এবং রৌদ্রদগ্ধ মুখ আপেলের মত লাল। চোখের ভ্রূ কালো, চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল এবং গোঁফজোড়া শুঁয়াপোকার মত। তাহার তরুণ মুখের নিরীহ নির্ম্মলভাবে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইত।

"এই নাও তোমার চিঠি", বলিয়া নামি তাকেওর হাতে পত্রখানি দিল।

"ওঃ! বাবার চিঠি দেখছি!" বলিয়া একটু ঘুরিয়া বসিয়া যুবক পত্রখানি খুলিল। খামের মধ্য হইতে আর একখানা পত্র বাহির হইয়া পড়িল।

"এই নাও তোমারও একখানা চিঠি। তিনি ভাল আছেন। হা! হা! ক্যা মজা! আমি যেন তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি!" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাকেও পত্রখানি একধারে রাখিয়া দিল।

পত্র পাঠ শেষ হইলে নামি মুখ তুলিয়া আহারের টেবিল সাজাইতে ব্যস্ত বৃদ্ধাকে কহিল, "ইকু, বাবা তোমায় খুব সাবধানে থাকতে বলেছেন। তোমার এ জলহাওয়া সহ্য করা অভ্যেস নেই, অসাবধান হলে অসুখ বিসুখ হতে পারে।"

ইকু কহিল, "তাঁর বড় দয়া।"

যুবক কহিল, "আমি কিছু খেতে চাই। আজ সারাদিন চলেছি, কেবল দু'খানা ভাতের পিঠে খেয়ে। বেজায় ক্ষিদে পেয়ে গেছে।"

"এ কী মাছ?"

"একে য়্যামামে বলে—তাই না ইকু?"

"হ্যাঁ তাই বলে বটে।"

"এ ত দিব্যি খেতে লাগছে দেখছি, তোফা! দাও আর এক বাটি ভাত দাও।"

"ভারি ক্ষিদে পেয়েছে দেখছি আপনার!"

"তার আর আশ্চর্য্য কি! আজ-আমি হারুনা থেকে সোমা পাহাড়ের ওপর দিয়ে ফুতাৎসু-তাকের ওপর উঠেছিলুম। পাহাড়ের ওপর দিয়ে নেমে আসবার সময়; যাকে এখান থেকে আমার সন্ধানে পাঠান' হয়েছিল, সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা হল।"

"সত্যি? তুমি এত দূর গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। সোমা পাহাড়ের ওপর থেকে চমৎকার দৃশ্য দেখলুম।

তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে তাহ'লে বেশ হ'ত! একধারে সুবিস্তীর্ণ নিম্নভূমি, তার মাঝ দিয়ে তোনে নদী এঁকে বেঁকে ব'য়ে যাচ্ছে। অন্য ধারে একটার পর একটা পাহাড় ভিড় করে দাঁড়িয়ে; আর অনেক দূরে সকলের পিছনে ফুজিসানের শুভ্র মুকুট ঈষৎ দেখা যাচ্ছে। আহা! যদি কবিতা লিখতে পারতুম তো কবি হিতোমারোকে বলতুম 'রণং দেহি!' তারপর—যুবক হাস্য করিয়া বলিল, "দাও আর এক বাটি ভাত।"

নামি বলিল, "আহা, কত সুন্দরই না হবে! আমি যদি যেতে পারতুম!"

"হুঁঃ তুমি যাবে! তুমি সে পাহাড়ে উঠতে পারলে তোমায় একটা সোনার মেডেল দিতুম। জীবনে এমন খাড়া চড়াই কখনো দেখিনি! রাস্তায় ডজন খানেক লোহার শিকল আটকানো আছে, তাই ধরে ধরে উঠতে হয়। আমার পক্ষে এ কাজ কিছুই নয়। জানতো, এদাজিমার নৌ-বিদ্যালয়ে আমরা মাস্তলের ওপর উঠতে আর দড়ি ধরে ঝুলতে শিখেছি। কিন্তু তুমি? তোমার ছোট্ট পা দুখানি কখনো তোকিওর রাস্তা মাড়িয়েছে বলেও তো বোধ হয় না।"

লজ্জারক্তিম মুখে মৃদু হাস্য করিয়া নামি বলিল, "ঈস্! আমি যেন ইস্কুলে জিমন্যাষ্টিক শিখিনি—"

"ওঃ! পিয়ারেস ইস্কুলে আবার জিমন্যাষ্টিক! মনে পড়ে একবার তোমাদের ইস্কুল দেখতে গিয়েছিলুম। দেখি মেয়েরা পাখা হাতে নিয়ে পিয়ানোর তালে তালে কতকি অঙ্গভঙ্গী করছে, কেউ কেউ আবার 'বিশ্বমানবের গান' ধরেছে। প্রথমে মনে করেছিলুম কোন রকম সখের নাচটাচ হবে, তার পরে শুনলুম তাকেই বলে জিমন্যাষ্টিক" —বলিয়া তাকেও হাসিয়া উঠিল।

"হ্যাঃ কি বল তার ঠিক নেই!"

"আরো শোনো! য়্যামাকির মেয়ের পরেই একটি সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পিঠের ওপর দিয়ে লম্বা চুল ঝুলে পড়েছিল, তার পরণে—কি বলে? হ্যাঁ, ফুলের রঙের ঘাগরা। সে আগন্তুকের দিকে একবার চেয়েও দেখলে না, একমনে নাচতে লাগলো। সে মেয়েটি হচ্ছে নামিসান। কি? কথা কইছ না যে?"

"যাও! তুমি য়্যামাকির মেয়েকে চেনো না কি?"

"আমার বাবা য়্যামাকিকে স্নেহ করতেন। এখনো সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে। এইবার তোমার মুখ বন্ধ, কেমন?"

"তোমার কথা শুনলে—"

ইকু হাসিতে হাসিতে কহিল, "থাম বাছা, স্বামী স্ত্রীতে এমন করে ঝগড়া করে না।"

"ঠিক বলেছ, আর ঝগড়া নয়, এস চা খাওয়া যাক।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামিকো

পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে যাহার আগমন বর্ণিত হইল সে যুবকের নাম—ব্যারণ তাকেও কাওয়াশিমা। সম্প্রতি সে সুবিখ্যাত যোদ্ধা ভাইকাউণ্ট লেফটেনাণ্ট জেনারেল কাতাওকার জ্যেষ্ঠা কন্যা নামি-কাতাওকাকে বিবাহ করিয়াছে। কয়েক দিনের ছুটি লইয়া সে পত্নী ও তাহার বৃদ্ধা ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া ইকাওতে আসিয়াছিল।

নামির বয়স যখন আট বৎসর তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। নিতান্ত শিশু ছিল বলিয়া মাতাকে কেমন দেখিতে ছিল, সে কথা তাহার ভাল মনে পড়িত না; কিন্তু সে জানিত যে তাহার মাতা

অতি কোমলস্বভাবা ছিলেন, এবং ইহাও তাহার স্মরণ ছিল যে, মৃত্যুকালে তিনি আপনার হাতের মধ্যে তাহার ছোট হাত দুখানি লইয়া বলিয়াছিলেন, "বাছা, মা তোমার দূরদেশে চলে যাচ্ছে; তুমি ভালো মেয়ে হোয়ো, আর তোমার বাবাকে আর ছোট কো-চানকে ভালোবেসো।" তার পর তিনি কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি চলে গেলে তুমি আমার কথা ভাববে তো মা?"

এই বলিয়া তিনি নামির মস্তকে—এখন দীর্ঘ কেশ থাকিলেও তখন তাহার কেশ শিশুদের মত ছোট করিয়া কাটা ছিল—হাত বুলাইয়া দিয়াছিলেন। সে-সকল স্মৃতি নামির হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে সঞ্চিত হইয়া ছিল। সে-সব কথা সে না ভাবিত এমন দিন ছিল না।

এক বৎসর পরে বিমাতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বিষয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নামির মাতা বিখ্যাত সামুরাই বংশসম্ভূতা ছিলেন। তিনি সকল বিষয়ে কড়া হইলেও ভৃত্যেরা বলিত, "এমন শান্তিপূর্ণ বাড়ী মেলা ভার।" বিমাতা, তিনিও বিখ্যাত সামুরাই-বংশীয়া; কিন্তু তিনি শৈশবে শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন বলিয়া একেবারে ইউরোপীয়ের মত হইয়া গিয়াছিলেন। যা-কিছু নামির মাতার মধুর স্মৃতি জাগরিত করিতে পারিত সে-সকলেরই পরিবর্ত্তন না-করা পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মব্যস্ত প্রকৃতিতে সোয়াস্তি ছিল না। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়েই নিজের মতামত তিনি অসঙ্কোচে স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিতেন। নামির পিতা পরিহাস করিয়া বলিতেন, "আচ্ছা তাই হবে। তুমি আমার চেয়ে বোঝো ভাল।" একদিন তিনি তাঁহার প্রিয় সামরিক সেক্রেটারির সহিত 'সাকে' পান করিতে করিতে কথোপকথন করিতেছিলেন। পত্নীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "শোন হে নাম্বা, শিক্ষিতা স্ত্রী

বিবাহ করা কিছু নয়। অজ্ঞতার জন্য প্রতিপদে নির্দয় উপহাস সহ্য করতে হয়।” সুরসিক নাম্বা এ কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, কেবল আনাড়ির মত গেলাস লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। শুনা যায় সে না কি পরে স্ত্রীকে বলিয়াছিল, “আমাদের মেয়েদের খুব বেশী লেখাপড়ার দরকার নেই; সাধারণ ইস্কুলে যা শেখায় তা-ই যথেষ্ট।”

শৈশব হইতেই নামি বুদ্ধিমতী ও শান্তপ্রকৃতি। তাহার বয়স যখন মাত্র দুই বৎসর তখন সে ফটকের কাছে আসিয়া পিতাকে ‘বিদায়’ সম্ভাষণ করিত। পিতা ধাত্রীক্রোড়স্থিতা শিশু-কন্যার হাত হইতে টুপি লইতে ভালবাসিতেন। শিশুর অন্তঃকরণ বসন্তের তৃণ পত্রের মত! অকাল তুষারে আচ্ছাদিত হইলেও, তুষারের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আবার সতেজ হইয়া উঠে! মানুষ তাহা পদদলিত করিতে পারে না। মাতার মৃত্যুতে নামি যে-দুঃখ অনুভব করিয়াছিল, তাহা আট বৎসরের বালিকার পক্ষে সুগভীর হইলেও, সূর্য্যের করুণারশ্মি তাহার উপর পড়িলে সে যে পুনরায় মনোহর পুষ্পে প্রস্ফুটিত হইবে, সে বিষয়ে কে সন্দেহ করিতে পারিত? মস্ত মুখ ও কথঞ্চিৎ-ট্যারা-চক্ষু-বিশিষ্টা, বিদেশী-ধরণে-চুলবাঁধা, অতিমাত্রায়-সুগন্ধি-মাখান-পরিচ্ছদে-সজ্জিতা বিমাতার সহিত যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখন স্বভাবতই তাহার কেমন কেমন ঠেকিয়াছিল। বালিকার প্রতি আশ্চর্য্য রকম বিদ্বেষভাবাপন্ন না হইলে বিমাতা শান্ত নামিকে সহজেই বশে আনিতে পারিতেন। বিচারবুদ্ধিহীনা, স্বার্থপর, পাণ্ডিত্যাভিমানিনী বিমাতা আট নয় বৎসরের এই অকপট সরলা বালিকার সহিত, সে যেন পূর্ণ যৌবনা নারী, এমনি ব্যবহার করিতেন।

বেচারা সদাই একাকিনী থাকিত,- ভাবিত জগৎ কত দুঃখময়, কত স্নেহহীন! নামির মাতা আছেন, কিন্তু সে তাঁহাকে ভালবাসিতে

পারে না, ভগ্নী আছে, তাহাকেও স্নেহ করিতে পারে না! অবশ্য তাহার পিতা আছেন, ধাত্রী ইকু আছে, এবং তাহার আপন মাতার ভগিনী মাসিমা আছেন। কিন্তু সে তাহাদের যতই ভালবাসুক না কেন, তাহার মাসিমা ত তাহার সঙ্গে থাকেন না, আর ইকু সামান্য ভৃত্য মাত্র। আর ইকুই বা কি করিবে? বিমাতার দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে। ইকু যদি নামির প্রতি সামান্য স্নেহ দেখায় বা তাহার নিকট হইতে সামান্য সস্নেহ ব্যবহার পায় ত পরিণামে অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবে না। পিতা, তিনি স্নেহ ভালবাসার অবতার বটে, কিন্তু তিনিও বিমাতার মত না লইয়া কোন কাজ করিতেন না; নামির ভালর জন্যই তাঁহাকে এরূপ করিতে হইত। বিমাতার সম্মুখে তিনি তাহাকে ভৎ'সনা করিতেন, আবার তাঁহার অসাক্ষাতে তাহাকে স্নেহমাখা কথায় সান্ত্বনা দিতেন। পিতার মনের মধ্যে এই যে একটা অস্পষ্ট ঝড় বহিত তাহা বুদ্ধি-মতী নামির অগোচর ছিল না। পিতার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাঁহার জন্য সে অকাতরে সকল কষ্ট সহ্য করিত।

এ মনোভাব সামান্যমাত্রও প্রকাশিত হইয়া পড়িলে বিমাতা নামিকে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত করিতেন। আবার নামি যদি গম্ভীর উদাসীনভাবে থাকিত তাহা হইলেও তাহাকে মূঢ়, একগুঁয়ে ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া তীব্র ভৎ'সনা করিতে ছাড়িতেন না। একবার তুচ্ছ কি-এক কারণে ইংরেজি তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে চোস্ত ভাষায় হুড়হুড় করিয়া তিনি তাহার উপর কত অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেন। কেবল নামি যে গালাগালি খাইল এমন নয়—তাহার স্বর্গীয়া মাতাও লাঞ্ছনার পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়া ধন্য হইলেন! যখন তিরস্কারের প্রত্যুত্তর দিতে ইচ্ছা হইত, তখনই পিতার কথা মনে পড়িয়া যাইত —কঠোর কথাগুলি মনেই থাকিয়া যাইত, আর উচ্চারিত হইত না।

আর একবার তাহাকে বড়ই অন্যায়ভাবে সন্দেহ করা হইয়াছিল সেবার সে গোপনে স্বীয় দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া নীরবে কত অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল! কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহার পিতা ছিল? হাঁ, তাহার স্নেহময় পিতা ছিল। কিন্তু গৃহমধ্যেই যাহার জগৎ সীমাবদ্ধ, সে বালিকার পক্ষে এক মাতা পঞ্চ পিতার তুল্য।

ভাইকাউণ্ট বলিতেন, "বাস্তবিকই নামির স্বভাবে শিশুসুলভ কিছুই নেই। সে এত নির্জীব, এমনই বিষণ্ণ!" পুষ্পে পুষ্পে কোন পার্থক্য নাই—তা সে কদাকার মৃৎভাণ্ডেই ফুটুক, আর মূল্যবান চীনা মাটির টবেই থাকুক, তাহারা সকলেই সূর্য্যের আলো ও উত্তাপের ভিখারী; কিন্তু নামি নিরবচ্ছিন্ন তিমিরেই বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল।

তাই যখন নামির বিবাহ স্থির হইল, এবং অবশেষে বিবাহ হইয়াও গেল তখন সে তৃপ্তচিত্তে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল। তাহার পিতা, বিমাতা, মাসিমা, ইকু—তাহারাও স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বৃদ্ধা ধাত্রী অনুযোগ করিত, ভাইকাউণ্টেস নিজে সৌখিন পোশাক পরিতে ভালবাসিলেও নামিকে সাধারণ পোশাক ব্যতীত আর কিছুই দিতেন না। নামির বধূসজ্জার অপ্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিয়া ধাত্রী ক্রন্দন করিয়াছিল, এবং নামির মাতা যখন বাঁচিয়া ছিলেন, সেই অতীত সময়ের বৃথা স্বপ্ন তাহার মনে পড়িতেছিল। তবুও পিতার গৃহ পরিত্যাগ করিতে পাইবে বলিয়া নামির আনন্দ হইতেছিল। অজানিত সুখ ও স্বাধীনতা তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে এই চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে পিতার সহিত বিচ্ছেদও তাহার কষ্টকর বোধ হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'ফার্ণ'-সংগ্রহ

ইকাও হইতে মিজুসাওয়া যাইবার পথ প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ হইবে। তৃণগুল্মহীন পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া রাস্তাটি সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে; কেবল এক স্থানে উহা একটা উপত্যকার মধ্যে ডুব দিয়াছে, অন্য স্থানে একটা কন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপর পার্শ্বে বাহির হইয়াছে। নিম্নে ও পশ্চাতে যোমোর সমতল ভূমি প্রসারিত। পথের দক্ষিণে ও বামে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি। যখন বিগত বৎসরের দগ্ধ ঘাস ও আগাছার ভস্মে কৃষ্ণবর্ণ ভূমির উপর বসন্ত-সমাগমে কচি ঘাস ও বিচিত্রবর্ণ পত্রপুষ্প মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তখন মনে হয় যেন সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত একখানা গালিচা বিছান' রহিয়াছে। প্রকৃতিপ্রেমিকের নিকট এমন স্থানে দীর্ঘ বসন্তের দিনও নিতান্ত ছোট বলিয়া বোধ হয়।

রৌদ্রালোকিত অপরাহ্ণে একদিন তাকেও ও নামি, ইকু এবং অন্য একটি পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া কচি 'ফার্ণ' সংগ্রহ করিতে সেখানে গিয়াছিল। ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য তাহারা একটি সুন্দর স্থান নির্ব্বাচিত করিল। পরিচারিকা সেখানে একখানি কম্বল বিছাইলে তাকেও ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। নামি কিন্তু খড়ের চটি খুলিয়া রাখিয়া, গোলাপী রঙের রুমাল দিয়া 'কিমোনো' আস্তে আস্তে ঝাড়িয়া বসিয়া কহিল 'কেমন নরম! এমন শয্যা রাজার উপযুক্ত।"

"দিদিমণি, মাপ করুন—ঠাকরুণ, তোমায় আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেক দিন তোমায় এমন গান গাইতে শুনি নি," এই কথা বলিয়া পুলকোজ্জ্বল চোখে ইকু তাহার মুখপানে চাহিল।

"আজ অনেক গান গেয়েছি, বড় তৃষ্ণা পেয়েচে।"

পরিচারিকা কহিল, "ওই যাঃ! চা আনা হয়নি তো! বড় অন্যায় হয়ে গেছে।" একটি পুঁটুলি খুলিয়া সে কমলালেবু, কেক্, পিঠে প্রভৃতি বাহির করিল।

"কমলালেবুতেই হবে", এই বলিয়া একটা লেবু ছাড়াইয়া তাকেও কহিল, "নামি-সান* কক্‌খনো এমন ছাড়াতে পার না, পার কি?"

"পারি না ত কি? নিশ্চয়ই পারি।"

পরিচারিকা কহিল, "কর্ত্তা আপনি যে 'ফার্ণ' তুলেচেন তাতে যে অনেক আগাছা!"

তাকেও কহিল, "সাবধান! অন্যের দোষ দেখিয়ে নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা হচ্ছে! বাঃ কি সুন্দর দিন! ভারি আনন্দ হচ্ছে।"

নামি কহিল, "সত্যি বড় সুন্দর আকাশ! ঠিক যেন মেয়েদের পোশাকের সুন্দর একখানা কাপড়! হয়ত নাবিকের কোর্ত্তা তার চেয়েও ভাল হয়, কেমন?"

"সমস্ত জিনিসে কেমন সুন্দর গন্ধ! ঐ শোন কোকিল ডাকচে।" তারপর বৃদ্ধা ধাত্রী পরিচারিকাকে বলিল, "আবার কাজ আরম্ভ করা যাক, কি বল মাৎসু?" তারপর উভয়ে আরও 'ফার্ণ' সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

"কতকগুলো 'ফার্ণ' রেখে দিতে ভুলো না। নামি-সান বড় চঞ্চল, না?"

---

* 'সান, সামা, কুন—একই অর্থবাচক। ইহাদের অর্থ মহাশয়, মহাশয়া, কুমারী ইত্যাদি। কুন কেবলমাত্র সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। ভৃত্য প্রভুকে সম্বোধন করিবার সময় 'সামা' বলে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শিষ্ট সম্বোধন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সম্বোধন করিবার সময় অনেক সময় 'সান' ব্যবহার করেন।

"ঠিক কথা।"

"নামি ক্লান্তিবোধ করচ না?"

"না আজকে মোটেই হাঁপাই নি। আমার মনে হচ্ছে এত আনন্দ কখন পাই নি।"

"সমুদ্রে সুন্দর দৃশ্য অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু উঁচু পাহাড় থেকে এই যে ভূতল-দৃশ্য এ বড় সুন্দর। বেশ তোমার আরাম হচ্ছে, না? নীচে বাঁ দিকে সাদা ধবধবে একটা দেওয়াল দেখতে পাচ্ছ? ঐটে শিবুকাওয়া, ওঠবার সময় যেখানে আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজন করেছিলুম। আর এই দিকে নীল ফিতের মত একটা কি দেখতে পাচ্ছ? ওটা হচ্ছে তোনে নদী। দেখতে পাচ্ছ, কেমন? তারপর আকাগি পাহাড়ের ঢালু পার্শ্বদেশের ওধারে দেখ, ঐ যেখানে ধোঁয়া উঠচে—নীচে কারা যেন বসবাস করচে বলে বোধ হচ্ছে। ঐটি হচ্ছে মায়েবাসী নগর। ঐ দূরে রূপার সূতার মত ওটা কি? ওটিও তোনে নদী। আরো দূরে তুমি দেখতে পাচ্ছ না। ভারী ধোঁয়াটে। আমাদের একটা দূরবীন আনা উচিত ছিল, কি বল নামি? হয়ত ঐ অস্পষ্ট ধোঁয়াটে পিছনের দৃশ্যটাই বেশী সুন্দর!"

তাকেওর জানুর উপর হাত রাখিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নামি কহিল, "তোমার সঙ্গে যদি এখানে চিরকাল থাকতে পারতুম!"

দুইটি সোনালী প্রজাপতি দেখা দিল। তাহারা নামির কম্পিত অঞ্চল স্পর্শ করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। সেই ক্ষণে ঘাসের উপরে পদশব্দের মত একটা খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল এবং হঠাৎ প্রেমিক-যুগলের সম্মুখে বক্রভাবে একটা ছায়া পড়িল।

"তাকেও-সান!"

"এই যে চিজিওয়া-কুন্! এখানে আমাদের খুঁজে পেলে কেমন করে?"

নবাগতের বয়স প্রায় ছাব্বিশ হইবে, লেফটেনান্টের পোশাকে সজ্জিত। যুবকের আকৃতি অতি সুদর্শন, এবং আশ্চর্য্য তাহার মুখ রৌদ্রদগ্ধ নয়। কিন্তু কেমন-একটা-কি-ভাব তাহার মুখকে হতশ্রী করিয়াছিল—একটা বিদ্রূপের ভাব, আর গাঢ়-কৃষ্ণ চক্ষুর অপ্রীতিকর চাহনি! যুবকের নাম য়্যাসুহিকো চিজিওয়া, সে সম্পর্কে তাকেওর ভ্রাতা; এবং তাকেও সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নপদস্থ হইলেও সে সদরের একজন যোগ্যতম কর্ম্মচারী।

"তুমি এখানে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছ, কেমন? তাকাশাকিতে একটু কাজ ছিল। সেখানেই কাল রাত কাটিয়েছি। আজ সকালে সিবুকাওয়া গিয়েছিলুম, সেখানে শুনলুম ইকাও বেশী দূর নয়। তাই এই পথে এসে হোটেলে খোঁজ করে জানলুম তোমরা 'ফার্ণ' সংগ্রহে বেরিয়েছ। এই প্রকারে এখানে এসে হাজির হয়েছি। কালকেই কিন্তু আমায় ফিরতে হবে। তোমাদের বিরক্ত করচি না ত?"

"না, না কিছু না। মার সঙ্গে দেখা করেছিলে না কি?"

"হ্যাঁ, কাল সকালে করেছিলুম। তাঁকে বেশ ভালোই দেখলুম। কিন্তু তোমার ফেরার জন্যে তিনি খুব ভাবচেন বলে বোধ হল।" নামির মুখের উপর গাঢ়-কৃষ্ণ চক্ষুর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া চিজিওয়া কহিল, আকাসাকায় তোমাদের বাড়ীর সকলেও ভাল আছেন।"

কিছুক্ষণ হইতে নামির মুখ রক্তিম হইতেছিল, এবার তাহার মুখ আরো রক্তিম হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিল।

তাকেও কহিল, "দেখ, এইবার আমার বলবৃদ্ধি হয়েচে, আর আমায় হারায় কে? নৌ-সেনা আর স্থল-সেনার সংযোগ! হাজার বীর রমণী এলেও আমাদের এখন হারাতে পারবে না!" সেইক্ষণে প্রত্যাগত

ধাত্রী ও পরিচারিকাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এই এরা, আমি যখন একলা ছিলুম, আমায় দোষ দিচ্ছিল; বলছিল আমি ওদের মত অধিক পরিমাণ 'ফার্ণ' তুলতে পারিনি, আমি ফার্ণের বদলে আগাছা তুলছিলুম।"

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "চিজিওয়া-সামা, তুমি এখানে? কী আশ্চর্য্য!"

তাকেও কহিল, "কিছুক্ষণ আগে সাহায্য চেয়ে ওঁর কাছে তার পাঠিয়েছিলুম।"

ইকু কহিল, "আপনি ঠাট্টা করছেন। সত্যি পাঠিয়েছিলেন না কি? আপনি তাহলে কাল ফিরচেন? হ্যাঁ, ফেরবার কথায় মনে পড়ে গেল, খাবারের জোগাড় করবার জন্যে আপনাদের আগেই আমাদের ফিরতে হবে।"

"তা বটে! তবে তাই কর। চিজিওয়াও আমাদের সঙ্গে রাত্রে আহার করবেন, ভালো কিছু তৈরি করে রাখবে। দেখতে পাবে আমাদের নেকড়ে বাঘের মত ক্ষিদে পেয়েছে। কি, তুমিও যাচ্ছ না কি নামি? তুমি আমাদের সঙ্গে থাক। দলবলের সঙ্গে যাবার চেষ্টা না কি? চিন্তা নেই। আমরা তোমাকে খেয়ে ফেলবো না।"

নামি 'না' বলিতে পারিল না। ইকু ও পরিচারিকা সব জিনিস-পত্র একটা পুঁটুলিতে বাঁধিয়া রওয়ানা হইল।

তিনজনে আবার 'ফার্ণ' সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। তখনো বেলা ছিল, তাই তাহারা পাহাড় হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে মিজুসাওয়া পর্য্যন্ত গেল।

মোনোকিকি পাহাড়ের পার্শ্বদেশ সন্ধ্যা-সূর্য্যের অন্তিম কিরণে ঝলমল্ করিতেছিল। পথের বামে ও দক্ষিণে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি সেই

সোনার কিরণ বুকে ধরিয়া একখানা আগুনের চাদরের মত জলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে সঙ্গীহীন দেবদারু দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করিয়াছে। দূরে, বহু দূরে পাহাড়গুলি আলোক-বন্যায় প্লাবিত। তাহাদের পাদদেশস্থিত গ্রামের বহু উনান হইতে ধূম নির্গত হইতেছিল। গরুগুলি মন্থরগামী চালকের তাড়নে হাম্বারব করিয়া শব্দহীন সন্ধ্যা মুখর করিয়া তুলিতেছিল।

কথোপকথন করিতে করিতে তাকেও ও চিজিওয়া আগে আগে চলিয়াছে, নামি তাহাদের পশ্চাতে যাইতেছে। তিনজনে ধীর পদ-বিক্ষেপে নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া সূর্য্যালোকিত উর্দ্ধগামী পথের নিকটবর্ত্তী হইল।

হঠাৎ তাকেও থামিল।

"যাঃ চ'লে! ছড়িগাছা ফেলে এসেচি! ফেরবার সময় যেখানে খানিকক্ষণ জিরিয়েছিলুম, সেখানে। দাঁড়াও একটু, নিয়ে আসি।"

নামি কহিল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

"না না, তুমি দাঁড়াও। বেশী দূর নয়, দৌড়ে যাচ্ছি।"

তাকেওর কথায় বাধ্য হইয়া নামিকে থাকিতে হইল। ফার্ণের গোছা ভূমিতে ফেলিয়া তাকেও দ্রুতপদে নিম্নভূমিতে নামিয়া গেল।

তাকেও চলিয়া গেলে নামি চিজিওয়ার নিকট হইতে কয়েক পদ দূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিম্নভূমির পরপারে পাহাড়ের উপর তাকেওর চেহারা অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। মোড় ফিরিলে তাহাও অবিলম্বে অদৃশ্য হইল।

"নামিকো-সান!"

নামি মুখ ফিরাইয়া ছিল, এরূপ পরিচিতভাবে আহূত হইয়া শিহরিয়া উঠিল।

নিকটে আসিয়া চিজিওয়া পুনরায় ডাকিল, "নামিকো-সান!"

নামি দু' এক পদ পিছাইয়া গেল। মুখ তুলিয়া সেই গাঢ়-কৃষ্ণ চক্ষুদ্বয়ের একদৃষ্টে চাহনি দেখিয়া আবার মুখ ফিরাইল।

"আমি তোমায় অভিনন্দন করচি!"

নামি নীরব রহিল। তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

"আমি তোমায় অভিনন্দন করচি! তুমি নিশ্চয়ই খুব সুখী হয়েচ! কেমন?" ঘৃণার স্বরে চিজিওয়া কহিল, "তুমি জান, একজন সুখী হতে পারেনি।"

ভূমির উপর চক্ষু ন্যস্ত করিয়া নামি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছাতার অগ্রভাগ দিয়া ঘাস খোঁচাইতে লাগিল।

"নামিকো-সান!"

বিষধরের অবিচলিত পশ্চাদ্ধাবনে ত্রস্ত কাঠবিড়ালীর মত নামি এইবার শত্রুর সম্মুখীন হইল।

"কি?"

"ব্যারনের পদ আর টাকা—এ মন্দ নয়, কি বল? আমি তোমায় অভিনন্দন করচি!"

"কি বলছ তুমি?"

"মূর্খ হলেও ধনী সম্ভ্রান্তবংশীয়কে বিয়ে করা এবং যে ভালবাসে, সে অর্থহীন বলে তাকে ঘৃণা করা—আজকালকার উঁচু ঘরের মেয়ের এই হল নিয়ম—অবশ্য, তুমি বাদ!"

ধীরপ্রকৃতি হইলেও নামি বিষম কুপিত হইয়া উঠিল, চিজিওয়ার পানে সে অতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল।

"কি বলছ তুমি? কাপুরুষ কোথাকার! তাকেওর সামনে ঐ কথা বোলো একবার। বাবাকে মানুষের মত জিজ্ঞেস না করে আমাকে ঐ রকম চিঠি পাঠিয়েছিলে! আমি আর এ সহ্য করব না।"

"কি?"

চিজিওয়ার মূর্ত্তি ভীষণ দেখাইতেছিল। দন্তে অধর চাপিয়া সে নামির নিকটবর্ত্তী হইবার উপক্রম করিল।

এমন সময়ে সহসা নিম্নে অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনা গেল। অশ্বারোহী এক বৃদ্ধ কৃষকের মস্তক পাহাড়ের উপরে প্রকাশিত হইল। সায়ংকালীন নমস্কারার্থে অশ্বারোহী টুপি উঠাইয়া তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া সে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল; যুবক যুবতী কে তাহাই সে ভাবিতেছিল।

চিজিওয়া নড়িল না। তাহার মুখের কঠিনভাব কথঞ্চিৎ অপগত হইল বটে, কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত ওষ্ঠাধরে একটা বিদ্রূপের ভাব প্রকট হইয়া উঠিল।

"হুঁ, ওখানা রাখতে ইচ্ছে না হয় আমাকে ফেরত পাঠিও।"

"কী ফেরত পাঠাব?"

"যার কথা এখুনি বল্‌লে। যা তুমি ঘৃণা কর!"

"সেখানা আমার কাছে নেই।"

"কোথায় তবে?"

"আগুনে ফেলে দিয়েচি।"

"নিশ্চয়? কেউ দেখেনি ত?"

"কেউ দেখেনি।"

"ঠিক ত?"

"যাও! কথা কোয়ো না আমার সঙ্গে।"

নামির কুপিত দৃষ্টি চিজিওয়ার রুক্ষ চক্ষুর ভয়ানক অপ্রীতিকর চাহনি দ্বারা প্রতিহত হইল। সে-চাহনি তাহার শরীরের মধ্যে একটা শীতল কম্পন জাগাইয়া তুলিল। তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া লইল। ঠিক সেই সময়ে নিম্নভূমির পরপারে পাহাড়ের মাথায় তাকেও আবির্ভূত হইল। তাহার মুখ সান্ধ্য সূর্য্যের কিরণাঙ্কুরঞ্জিত চেরী ফুলের মত রক্তিম দেখাইতেছিল।

নামি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

"নামিকো-সান!"

চিজিওয়া বার বার নামির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নামি কিছুতেই তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইল না। অবশেষে সে কহিল, "নামিকো-সান, তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার আগে একটা কথা বলি। ভেবে চিন্তে কাজ কোরো। যেমন করে পারো, এ বিষয় তাকেও-সান ও তোমার মাতাপিতার কাছে গোপন রেখো। যদি না রাখ ত অনুতাপ করতে হবে, নিশ্চয়!"

ভীতিপ্রদ একটা চাহনির দ্বারা কথাগুলোর গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া চিজিওয়া সরিয়া গেল। কয়েকটা বন্য ফুল তুলিবার জন্য সে নত হইল।

দ্রুতপদবিক্ষেপে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাকেও পাহাড়ে উঠিয়া আসিয়া কহিল, "তোমাদের অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি, না? বাপ! দম বেরিয়ে গেছে একেবারে! সমস্ত রাস্তাটা ছুটেছি। ছড়িটা ঠিক পেয়েচি। নামি-সান কি হয়েচে? তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে না ত!"

সেইমাত্র যে ভায়োলেটগুলো তুলিয়াছিল, সেগুলো গুচ্ছ বাঁধিয়া বুকে আটকাইয়া চিজিওয়া কহিল, "তোমার ফিরতে এত দেরী হচ্ছে দেখে তুমি পথ ভুলে গেছ মনে করে উনি চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন।" এই কথা বলিয়া সে হাস্য করিল।

তাকেও হাসিয়া কহিল, "তাই না কি? এই বার চল বাড়ী যাওয়া যাক।"

তুষির উপর দিয়া পাশাপাশি তিনটি ছায়া ইকাও অভিমুখে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জ্যামাকির বাড়ী

অপরাহ্ণ তিনটার সময় তাকাশাকি হইতে যে গাড়ী ছাড়ে তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার এক কোণে বেঞ্চির উপর পা ছড়াইয়া দিয়া কেবলমাত্র একজন আরোহী বসিয়া ছিল। চুরুট টানিতে টানিতে সে একখানা কাগজ পড়িতেছিল। লোকটি আর কেহ নয়, য়্যাসুহিকো চিজিওয়া।

"দূর হোক!" বলিয়া কাগজখানা সে পার্শ্বে নিক্ষেপ করিল। কথাটা বলিবার সময় মুখ হইতে চুরুট পড়িয়া গিয়াছিল। রাগত-ভাবে সেটাকে পা দিয়া গুঁড়া করিয়া সে জানালার বাহিরে থুথু ফেলিল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করিল। তারপর অনিশ্চিত ভাবে কামরার সমস্তটা একবার পায়চারী করিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিল। দুই হাত বদ্ধ করিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার কুঞ্চিত কালো ভ্রূযুগল খুব কাছাকাছি হইয়া আসিল।

য়্যাসুহিকো চিজিওয়া পিতৃমাতৃহীন। তাহার পিতা কাওোশিমা-গণান্তর্গত একজন 'সামুরাই' ছিলেন। প্রাচীন রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধে তিনি নিহত হন। চিজিওয়া যখন মাত্র ছয় বৎসরের বালক তখন মহামারীতে তাহার মাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী—তাকেও কাওয়া-শিমার মাতা—তাহাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। মাসী তাহার প্রতি সদয় ছিলেন, কিন্তু মেসোর ব্যবহারে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। উৎসবাদির সময় তাকেও রেশমী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া উচ্চ আসনে বসিত; চিজিওয়ার জন্য অন্য ব্যবস্থা,—সূতি-পোশাক ও নিম্ন আসন। এইরূপে শৈশবেই সে নিজের দুরবস্থা অনুভব করিতে শিখিয়াছিল। তাকেওর মাতা পিতা পদমর্য্যাদা অর্থ—সবই আছে!

কিন্তু তাহাকে স্বীয় হস্ত ও মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া সংসারে নিজের পথ করিয়া লইতে হইবে! এজন্য স্বভাবতই সে অকেওকে দেখিতে পারিত না। মেসোকে সে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিল।

সে দেখিল জীবনে কৃতকার্য্য হইবার দুই পন্থা বিদ্যমান—একটি প্রশস্ত, অপরটি তাহার বিপরীত। যা থাকে কপালে, সহজ পথটাই অবলম্বন করিবে; ইহাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল। তাই সামরিক বিদ্যালয়ে পাঠের সময়—মেসো তাহাকে সেখানে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন—যখন তাহার সহপাঠীরা পরীক্ষা ও নম্বর লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকিত, চিজিওয়া তখন স্বপ্রদেশস্থ ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিত। বাছিয়া বাছিয়া সে এমন-সব লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতেছিল, যাহারা ভবিষ্যতে তাহার মুরুব্বি হইতে পারিবে। ইস্কুল হইতে বাহির হইবার পরও তাহার তৎপরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অন্যান্য সকলে যখন পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিবার আনন্দে আত্মহারা, সে তখন সামরিক সদরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহার সহপাঠীরা যখন এখানে সেখানে পদাতিক সৈন্যদলে প্রেরিত হইতেছিল, যখন তাহারা অফুরন্ত কুচকাওয়াজের তাড়নে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চিজিওয়া তখন সেই বাঞ্ছনীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ধূমপানের আড্ডায় অনেক গুরুতর সামরিক গুপ্ত-তত্ত্বের কথা কর্ণগোচর হওয়া অসম্ভব নয়।

অতঃপর প্রয়োজনীয় বিষয় হইল বিবাহ! সে বুঝিত জীবনে কৃতকার্য্য হওয়া কেবলমাত্র ভালো-রকম বৈবাহিক সম্বন্ধের উপরই নির্ভর করে। সে বিবাহের ক্ষেত্রটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল অমুক মার্কুইসের কন্যার সহিত অমুক ব্যারনের বিবাহ হইবে; কাউণ্টের কন্যার সহিত অমুক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বিবাহ হইবে; এই ক্রোড়পতির কন্যার সহিত অমুক মার্কুইসের বিবাহ হইবে! অবশেষে

তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জেনারেল কাতাওকার পরিবারের উপর নিপতিত হইল। রক্ষিত সৈন্যদলভুক্ত হইলেও জেনারেল কাতাওকা সুবিখ্যাত ও রাজদরবারে বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। প্রচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার প্রবল প্রতিপত্তির কথা বুঝিতে চিজিওয়ার বিলম্ব হইল না। সে ছল করিয়া ধীরে ধীরে জেনারেলের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং তাঁহার পরিবারে পরিচিত হইবার জন্য কৌশলে নানা-প্রকার চাল চালিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা নামির উপরেই তাহার দৃষ্টি ছিল। এরূপ করার কারণ এই যে, সে দেখিয়াছিল নামি জেনারেলের প্রিয়পাত্রী; এবং তাহার বিমাতা তাহাকে দেখিতে পারিত না, প্রথম সুযোগেই সে তাহার একটা বিবাহ দিয়া দিবার চেষ্টায় ছিল। নামির শান্ত ভদ্র ব্যবহারও যে তাহার নির্ব্বাচনের অন্য কারণ নয় তা বলা যায় না। চিজিওয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। জেনারেল তাঁহার মনের ভাব কখনো প্রকাশ হইতে দিতেন না। তাই তাঁহার মতামত চিজিওয়া সহজে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সে-যে কাতাওকা-গৃহিণীর প্রিয়পাত্র হইয়াছে সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত ছিল। পঞ্চদশবর্ষীয়া দ্বিতীয়া কন্যা প্রগলভা কোমাও তাহার বিশেষ বন্ধু। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত আরো দুইটি সন্তান ছিল; কিন্তু ইহাদের সহিত তাহার কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বর্ত্তমান গৃহিণীর আগমন-কালে যখন আর-সব ভৃত্যেরা জবাব পাইল, তখন কেবল নামির মাতার সময়ের বৃদ্ধা ধাত্রী ইকুই জেনারেলের বিশেষ অনুরোধে বিতাড়িত হয় নাই। এই ধাত্রীটি সর্ব্বদাই নামির সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। চিজিওয়ার প্রতি সে কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করিত না। এই যা একটু চিন্তার কথা। কিন্তু সে নিজেই নামির চিত্ত জয় করিবে সংকল্প করিয়াছিল, তাই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় নাই। সুযোগের জন্য সে এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া রহিল। অবশেষে

অধীর হইয়া একখানা প্রেম-লিপি পুরু খামের মধ্যে ভরিয়া মেয়েলি ছাঁদে ঠিকানা লিখিয়া ডাকযোগে নামির নিকট পাঠাইল।

সেই দিন হঠাৎ তাহাকে কর্ম্মসূত্রে অন্যত্র যাইতে হইল। তিন মাস পরে যখন সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন শুনিয়া অবাক হইয়া গেল যে, ইতিমধ্যে লর্ডস্ মহাসভার সভ্য ভাইকাউন্ট কাতোর ঘটকতায় তাহারি মাসতুতো ভাই তাকেও-কাওয়াশিমার সহিত নামির বিবাহ হইয়া গেছে।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতায় কুপিত হইয়া চিজিওয়া নামিকে উপহার দিবার জন্য কিওতো হইতে আনীত ক্রেপের কাপড়খানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। হায়, সে আশা করিয়াছিল, উহার উজ্জ্বল বর্ণ ই তাহার সফলতার কারণ হইবে!

কিন্তু চিজিওয়া ব্যর্থতায় একেবারে দমিবার লোক নয়। শীঘ্রই আশা-ভঙ্গের বেদনা তাহার মন হইতে তিরোহিত হইল।

তাহার কিন্তু আশঙ্কা হইল যে, যদি নামি তাহার পিতা বা স্বামীকে সেই প্রেম-পত্রের কথা বলে ত তাহার আর একটি ক্ষতি হইবে, সে এক জন প্রতিপত্তিশালী মুরুব্বি হারাইবে। তাহার প্রতি নামির মনের ভাব কি তাহা সে জানিত না। তাই তাকাশাকি গিয়া ইকাওতে সে নবদম্পতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সতর্কতার সহিত খোঁজখবর করিল। তাকেওর প্রতি ঘৃণাটাই তাহার মনে আপাতত প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

কে-একজন "তাকেও, তাকেও" বলিয়া ডাকিতেছে ভাবিয়া চিজিওয়া হঠাৎ তাহার দিবা-স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সে দেখিতে পাইল গাড়ীখানা সেইমাত্র একটা ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে ও কুলি হাঁকিতেছে, "আগেও, আগেও!"

"আ, মোলো!" বলিয়া নিজের উপর বিরক্ত হইয়া চিজিওয়া

দাঁড়াইল, কামরাটা একবার ঘুরিয়া আসিল। বিরক্তিকর কিছু যেন ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য একবার গা-ঝাড়া দিয়া সে পুনরায় আসন গ্রহণ করিল। তাহার চোখে মুখে ঘৃণার চিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল।

গাড়ী 'আগেও' ছাড়িয়া বায়ুবেগে কয়েকটা ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া 'ওজি' পৌঁছিল। পাঁচ ছয়জন আরোহী কাষ্ঠপাদুকা দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের কাঁকরে শব্দ করিতে করিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একটি পুরুষ, বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে, ঘোর লাল মুখ; তাহার বাম চোখের নিচে মটরের মত একটি লাল আঁচিল। সে দ্বিগুণিত রেশমের মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত। তাহার ক্রেপের কোমরবন্ধে মোটা সোনার চেন জড়ান ও ডান হাতের আঙুলে ভারি সোনার আংটি।

বসিবার সময় হঠাৎ চিজিওয়ার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল।

"ও, চিজিওয়া-সান!"

"এই যে, ভাল ত?"

"কোথা গিয়েছিলে?" এই কথা বলিতে বলিতে লাল-আঁচিল-বিশিষ্ট লোকটি চিজিওয়ার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

"তাকাশাকি।"

"তাকাশাকি?" কিছুক্ষণ চিজিওয়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিম্নস্বরে লোকটি বলিল, "তুমি কি ব্যস্ত আছ? না থাক ত সান্ধ্য ভোজনটা এক সঙ্গেই করা যাবে।" চিজিওয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

হাসিবার খেয়াঘাটের নিকট, জলের খুব কাছে একখানি বাড়ী। বাড়ীর উপর "হোজো য়্যামাকির গৃহ" লেখা না থাকিলে উহা একটা বাবু-লোকেদের আড্ডা বলিয়া ভ্রম হইত। দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠ —তাহার কাগজের দেওয়ালের উপর চিত্তহারী সঙ্গীতের সুরের মাঝে

সৌখীন "শিমাদা"র* ছায়াপাত হইলে অসঙ্গত হইত না; কিংবা তাহার জীবৎ সবুজ মাদুরের উপর রক্তবর্ণ আস্তরণ বিছাইয়া তাসের মজলিস বসিলেও বসিতে পারিত—নেহাত সাধারণ বৈদ্যুতিক আলোকের পরিবর্ত্তে আবরিত দীপে আলোকিত এমন একটি প্রকোষ্ঠে, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত গেলাশ ও প্লেটের মাঝে, চিজিওয়া ও "লাল-আঁচিল" দিব্য আরামে বসিয়া ছিল। এই "লাল-আঁচিল" আর কেহ নয়, এই বাটির মালিক, হোজো য়্যামাকি।

সেখানে যে তাহাদের আদেশের অপেক্ষায় কোনো পরিচারিকা উপস্থিত ছিল না, সেটা তাহাদের ইচ্ছানুসারেই। য়্যামাকির সম্মুখে একখানা খোলা নোট-বই, এবং তার উপর একটা পেন্সিল। উহার মধ্যে অনেকের নাম ধাম ও উপাধি লিখিত ছিল। নামগুলি নানারূপে চিহ্নিত; বৃত্তাকার, চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ, ১, ২, ক, খ, প্রভৃতি নানা প্রকারের চিহ্ন। কতকগুলি চিহ্ন কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, কতকগুলি বা পুনর্লিখিত হইয়াছে।

"যাক চিজিওয়া-সান, তবে তাই ঠিক; কেমন? কিন্তু এ যেই ঠিক হয়ে যাবে তখনি আমায় জানানো চাই। ঠিক পারবে ত?"

"নিশ্চয়ই। এরি মধ্যে বিষয়টা মন্ত্রীর হাতে গিয়ে পৌঁছেচে। কিন্তু অপর পক্ষও খুব জবরদস্ত, তোমায় খুব মুক্তহস্ত হতে হবে।" খাতায় লিখিত একটা নাম দেখাইয়া, "এ লোকটা পাকা বদমাইস—একে বেশ করে দমিয়ে রাখতে হবে।"

"এ কেমন?"

"ও-ও সুবিধে নয়। আমি ওকে ভালরকম জানি না, কিন্তু

---

* এক প্রকার জাপানী খোঁপা। জাপানী গেইশা বা নর্ত্তকী (এখানে তাহাই বুঝাইতেছে) ও অবিবাহিতা যুবতীরা এরূপ খোঁপা বাঁধেন।

শোনা যায় লোকটা বেজায় ধার্ম্মিক। ওর কাছে যেতে হ'লে খোলা-খুলি নম্রভাবে যেতে হবে। আর অকৃতকার্য্য হও ত বিশেষ গোলযোগ।"

"সৈন্যদলে সমঝদার লোক আছে অনেক, কিন্তু ঠিক তার উল্টো লোকও আছে ততই। তুমি ত জানই, গেল বছর যখন আমরা একটা সৈন্যদলে পোশাক যোগাবার ভার পাই—সবই কেমন ভালোরকম উতরে গেল। কিন্তু একটা ক্যাপটেন ছিল—নামটা তার কি?—ওই যে যার লাল গোঁফ। সে বেটা আমাদের জিনিসের দোষ দেখিয়ে ভারি জ্বালাতন করেছিল। যখন আমাদের ম্যানেজার দস্তুরমাফিক তাকে এক বাক্স 'কেক' পাঠালে, সে বল্‌লে সে ঘুষ নেবে না; আর বল্‌লে যে সৈনিকের পক্ষে উপহারের দ্বারা চালিত হওয়া বিশেষ লজ্জার কথা। ভেবে দেখ, শেষে বাক্সটা সে মেঝের ওপর ছুড়ে ফেলে দিলে। বাক্সটা টাকায় ভর্ত্তি ছিল, ওপরে কেবল পাতলা এক থাক কেক! কি বিপদ! শরতের বৃক্ষপত্ররূপ কেকগুলো মেঝের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রৌপ্যময় তুষারকণার সহিত মিলিত হচ্ছে! এই না দেখে লোকটা আরো রেগে গেল, বল্‌লে এমন জঘন্য ব্যাপারের কথা সে কখনো শোনেনি। আমাদের কথা সমাজে প্রকাশ করে দেবে বলে শাসাতে লাগ্‌ল! তাকে কি থামান যায়! এই রকম লোকদের জন্যেই আমরা এত কষ্ট ভোগ করেচি। কষ্ট ভোগ করার কথায় মনে পড়ে গেল তাকেও-সানও সেই ধরণের লোক। সে দিন—"

"তাকেও বাপের এত সম্পত্তি পেয়েছে যে, সে যা ইচ্ছে তা করতে পারে—খোঁচার মত সরল ও শক্ত হতে পারে। আমার কথা তুমি ত জানই, একলা—"

"ও ভুলে গেছলুম!" য়্যামাকি চিজিওয়ার মুখের দিকে মুহূর্ত্ত মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পাঁচ টাকার দশখানা নোট বাহির করিল। "এই হচ্ছে তোমার গাড়ী ভাড়া। আসলটা পরে পাবে।"

"ধন্যবাদ, আমি এ নিলুম," বলিয়া চিজিওয়া সেগুলি ভিতরের পকেটে শীঘ্র পুরিয়া ফেলিল। "কিন্তু য়্যামাকি-সান!"

"কি?"

"একথা সকলেই জানে যে, না বুনলে শস্য কাটা চলে না।"

য়্যামাকি কাষ্ঠহাসি হাসিল। চিজিওয়ার পিঠ থাবড়াইয়া বলিল, "তুমি ভারি চালাক লোক। কী দুঃখের কথা তুমি খুব কম করেও 'কমিশারিয়েটের' প্রধান হওনি!"

চিজিওয়া হাসিয়া কহিল, "কিন্তু য়্যামাকি, বীর কিয়োমাসার ছোট তলোয়ার শিশুর হাতের 'তিন ফুট তিন ইঞ্চি'* তলোয়ারের চেয়েও বেশী কাজ করে।"

"বাঃ! কিন্তু বন্ধু, তোমায় এই কপাল-ঠোকা ঝুঁকির কাজে সাবধান করে দিচ্ছি। বাইরের লোক প্রায়ই কৃতকার্য্য হয় না।"

"আচ্ছা, বেশ। এটা কেবল অতিরিক্ত টাকা। এইবার যেতে হবে। এই বিষয়টা জানতে পারলেই দিন কয়েকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে এসে দেখা করব। ধন্যবাদ, দরকার নেই, রাস্তা থেকে একখানা 'কুরুমা' ডেকে নেব'খন।"

"আচ্ছা, তা হলে এস। আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। তাঁকে আমার মেয়ের সঙ্গে থাকতে হয়।"

"ও, ওতোয়ো-সান না কি? তার অসুখ করেছে না কি?"

"হ্যাঁ, প্রায় মাসখানেক হ'ল। সেই জন্যেই আমার গিন্নি তাকে এখানে এনেছেন। চিজিওয়া-সান, না ভেবে চিন্তে কখনো বিবাহ কোরো না, বা ছেলেপুলের জন্ম দিও না। টাকা যদি করতে হয় ত অবিবাহিত থাকার মত সুবিধে আর কিছুতে নয়।"

---

* বড় তরবারির নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য।

চিজিওয়া য়্যামাকির পল্লীভবন হইতে চলিয়া গেল। প্রভু ও পরিচারিকা তাহাকে ফটক পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিল।

অভ্যাগতকে বিদায় দিয়া য়্যামাকি ঘরে ফিরিল। নিঃশব্দে হড়কা-নিয়া দরজা খুলিয়া এক মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। সে গৌরবর্ণা, তাহার মাথায় পাতলা চুল ও সামনের দুটি দন্ত সুপ্রকাশিত।

"চিজিওয়া-সান গেছে ?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র গেল। ওতোয়ো এখন কেমন আছে ?" দাঁত-উঁচু স্ত্রীলোকটি মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল, "আমি ত আর ওর সঙ্গে পারি না!" পরিচারিকাকে কহিল, "কানে, তুমি একটু সরে যাও।" তারপর কহিল, "এই আজ সে একটা বাটি আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করেচে, কাপড় ছিঁড়েচে; সামান্য কারণে আরো কত কি করেচে। আর তার বয়স হলো আঠারো!"

"তা হ'লে তাকে সুগামোর গারদে পাঠানো যাক, কি বল ? আহা বেচারী!"

"এ ঠাট্টার সময় নয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তার জন্যে আমার দুঃখ হয়। সে আজ বলছিল, 'অকৃতজ্ঞ তাকেও-সান! কী নিষ্ঠুর সে! গত বৎসর নববর্ষের সময় আমি তাকে নিজের-হাতে-বোনা মোজা, রুমাল, দস্তানা, আরো কত কি পাঠালুম। এই নববর্ষে একটা লাল জামা তাকে উপহার দিলুম—সমস্ত নিজের পয়সায়। কিন্তু কাণ্ডটা দেখ একবার, আমাকে কিছু না জানিয়ে সে কি না সেই কদাকার মেয়েকে নামিকো-সানকে বিয়ে করবে। কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর! আমি য়্যামাকির মেয়ে, নামিকো-সান আমার ওপর টেক্কা দেবে? কী নিষ্ঠুর!' সে কাঁদতে লাগলো। ওগো, ওর কি একটা উপায় করা যায় না? ওযে তাকেও-কে বড্ড ভালবাসে!"

"দূর্! কথায় আছে, 'যেমন মা তেমনি মেয়ে!' তুমি ঐ দুষ্ট মেয়েটার উপযুক্ত মা। তুমি জান যে কাওয়াশিমা একজন নতুন রাজদরবারী, অর্থও তার যথেষ্ট; আর সে-যে নির্ব্বোধ এমন কথাও কিছুতেই বলা যায় না। ওতোয়োর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্যে আমরা যথাসাধ্য করেচি, কিন্তু সব ভেস্তে গেল। বিয়ে হয়ে গেছে। নামি-সানের মরণ না হ'লে, কিংবা তাকেও তাকে পরিত্যাগ না করলে ত আর আশা নেই। তাই এ-সব আজগুবি খেয়াল ছেড়ে আর কোনো ভালো লোকের সঙ্গে তার বিয়ে দাও। তুমি ত বাহাদুর মেয়ে, নও কি?"

"ও-সব বোকামি। আমি তোমার মত ভাবতে পারি না, তোমার মত আমি চতুর নই—যে-লোক কি না পঞ্চাশ বছর বয়সেও মেয়েদের কাছে ঘোল খায়!"

"তোমার সঙ্গে আমি ত কথায় পারব না, কিন্তু তুমি একটি মূর্খ—তার মানে তুমি সহজেই রেগে যাও। ওতোয়োকে আমিও তোমারই মত ভালবাসি। সে আমাদের মেয়ে। তাই অসম্ভব কথার স্বপ্ন না দেখে তার জন্যে এমন এক জায়গার সন্ধানে আছি যেখানে সে সারা জীবন সুখে থাকবে। এস ওয়ুমি তার সঙ্গে গিয়ে একটু কথা কওয়া যাক।" তাহারা বারান্দা দিয়া তোয়োর ঘরে গমন করিল।

হ্যোজো য়্যামাকি হীনাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে "ভদ্র ব্যবসায়ী"র মধ্যে পরিগণিত। ব্যবসায় আরম্ভের সময় তাকেওর স্বর্গীয় পিতার নিকট সে অনেক সাহায্য পাইয়াছিল, এবং সেইহেতু এখনও সে কাওয়াশিমা-পরিবারের প্রতি অনুরক্ত। ইহার কারণ, কেহ কেহ বলিত কাওয়াশিমা-পরিবার নূতন বড় লোকদের মধ্যে বিশেষ অর্থশালী বলিয়া; কিন্তু এরূপ সমালোচনা বড় বেশী তীব্র। সিবায় তাহার বাড়ী ছিল, এবং হাসিবা খেয়াঘাটের নিকট

একখানি পল্লীভবন ছিল। ইতিপূর্ব্বে সে ছিল একটি সুদখোর, কিন্তু এখন তাহার প্রধান কার্য্য হইতেছে সৈন্যদলে ও গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগে জিনিস যোগানো। তাহার পুত্র বাণিজ্য-বিজ্ঞান শিখিবার জন্য আমেরিকায় অবস্থান করিতেছে; কন্যা ওতোয়ো এই সেদিন পর্য্যন্ত 'পীয়ারেস' ইস্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছে। তাহার পত্নী—কেমন করিয়া এবং কোথায় তাহার সহিত বিবাহ হইল, এ কথা কেহ জানিত না—কিওতোর লোক, এইমাত্র জানা ছিল। সে সাদাসিদে স্ত্রীলোক; য্যামাকি কিরূপে তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতেছে এ কথা ভাবিয়া অনেকে অবাক হইত। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, য্যামাকির অনেকগুলি প্রেমপাত্রী ছিল, যাহাদের প্রতি 'সুন্দর', 'কান্ত' ও অন্যান্য ঐ জাতীয় বিশেষণগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে; এবং তাহারা সদাই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করে। এ কথা তাহার স্ত্রী ভালোরকমই জানিত।

প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ 'কুঞ্জে' একটি বীণা, একটি 'ম্যাণ্ডোলিন' ও কাচের বাক্সে একটি বড় পুতুল। এক কোণে একটি সুন্দর লিখিবার টেবিল, অন্য কোণে একখানি প্রকাণ্ড আয়না। এ সুন্দর ঘরে কোন্ ওমরাহ-নন্দিনী বাস করেন ইহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া ঘরের মাঝে রেশমী বিছানার দিকে চাহিবার লোভ হয়। উহার উপর প্রায় সপ্তদশবর্ষীয়া এক তরুণী পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে; বৃহৎ শিমাদা-খোঁপা-বাঁধা চুল নির্ম্মমভাবে বালিসের উপর মর্দ্দিত হইতেছে। তাহার গায়ের রং গোলাপী, গোল-গাল ভরাট কপোল। ইহা দেখিয়া তাহাকে সুন্দর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহার চেহারাটা একটু বেশী রকম গোলাকার। তাহার ওষ্ঠাধর বিযুক্ত, যেন সেগুলি বন্ধ করিবার শক্তি নাই; কোমল ভ্রূর নীচে চোখ দুটি অতিরিক্ত মাংসে পরিবেষ্টিত; বসন্তের কুয়াসায় আচ্ছাদিত সবে-মাত্র সুপ্তোত্থিতের চোখের মত

দেখায়। তাহার আদেশ শ্রবণে মনে মনে হাসিতে হাসিতে সেই-মাত্র ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত পরিচারিকার উদ্দেশে "বোকা" এই কথা বলিয়া, তরুণী অসহিষ্ণু ভাবে গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া 'কুঞ্জ' হইতে একই-প্রকার-'হাকামা'-পরিহিত এক দল ইস্কুলের মেয়ের একখানি বড় ছবি তুলিয়া লইল। সূতার মত সরু চোখে সে উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিল। ছবির মধ্যে একটি চেহারার মুখের সামনে তুড়ি দিল। অবজ্ঞাটা আরও স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্ত সে নখ দিয়া ছবিখানি আঁচড়াইতে লাগিল।

হড়কানিয়া দরজা খোলার শব্দ হইল।

"কে? তাকে না কি?"

"হ্যাঁ, আমি তাকে,—টেকো তাকে," এই বলিয়া তাহার পিতা য়্যামাকি ও মাতা হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন, এবং শয্যার নিকট উপবেশন করিলেন। তরুণী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছবিখানি লুকাইবার চেষ্টা করিল।

"কেমন আছ ওতোয়ো? ভাল? এইমাত্র লুকুলে কি? দেখি, দেখি! ওটা কি আমাকে দেখাও। এ ত নামিকো-সানের মুখ, তাই নয় কি? ওঃ! এটা কি বিশ্রীভাবে নষ্ট করেচ! এমন অন্যায় কাজ করার চেয়ে দুপুর রাতে কোনো মন্দিরে গিয়ে অকল্যাণ কামনা করা শতগুণে ভাল!"

মুখ বিকৃত করিয়া তাহার পত্নী বলিল, "কথার ছিরি দেখ!"

"ওতোয়ো তুমি হোজো য়্যামাকির মেয়ে, কেমন? সাহস করে আবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে দেখ। তোমার ভালবাসা যে প্রত্যাখ্যান করে, এমন একটা সামান্য লোকের প্রতি অনুরক্ত না থেকে মিৎসুই বা মিৎসুবুশির মত ক্রোড়পতির ছেলে পাকড়াও; কিম্বা কোনো

সেনাপতি বা প্রধান মন্ত্রীর ছেলে; বা সব চেয়ে যা ভাল, কোনো বিদেশী রাজপুত্র। তুমি অত দমে' গেলে কেন?"

মাতার সম্মুখে যতই খিট্ খিট্ করুক আর কাঁদুক না কেন, পিতার সম্মুখে ওতোয়ো একেবারে নিরুপায়। সে বিষণ্ণ মুখে রহিল, কোনো উত্তর দিল না।

"উত্তর দিচ্ছ না যে? তুমি তাকেও-সানকে ভুলতে পারছ না? ও! তুমি এখনো তাকে ভালবাস, কেমন? দেখ ওতোয়ো কিওতো বেড়াতে যাবে? ভারী আমোদে যাবে! দেখবার মত অনেক ভাল ভাল জায়গা আছে, আর তা ছাড়া তুমি নিসিজিনে * গিয়ে একটি সুন্দর 'ওবি' বা একপ্রস্থ পোশাক আনতে পার। কেমন? যাবে ত? এমন সুযোগ ছেড়ো না।" পত্নীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "ও-সুমি, তুমিও ত অনেক দিন ওখানে যাওনি। তুমি বরং ওতোয়োর সঙ্গে যাও।"

পত্নী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ ত?"

"আমি? পাগল! আমি কত ব্যস্ত আছি তা জান!"

"তা হ'লে আমিও যাব না।"

"কি রকম? তুমি আমার আদেশ অমান্য করবে?"

"হা, হা!"

"কি?"

"হা, হা, হা!"

"তোমার ও-রকম হাসি আমার ভালো লাগে না। কেন যাবে না তা আমাকে বল।"

পত্নী কহিল, "আমি তোমায় চোখের আড়াল করতে পারি না।"

"দূর! ওতোয়োর সামনে এমন কথা কেমন করে বল?

---

* বস্ত্রবুননের জন্য বিখ্যাত।

ওতোয়ো তোমার মা যা বলছেন ও মিছে কথা। ও-কথায় কর্ণ-পাত কোরো না।"

ওহমি কহিল, "আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না।"

"থাম, থাম! ওতোয়ো, ভেবো না। ধৈর্য্য ধর, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বগৃহে জেনারেল

একদা শনিবার অপরাহ্ণ সময়ে ভাইকাউণ্ট লেফটেনাণ্ট-জেনারেল কাতাওকা পাঠাগারের চেয়ারে আরামে বসিয়া ছিলেন। জুন-মাসের মধ্যভাগ। তাঁহার বাড়ীর নিকটস্থ বাদাম গাছগুলি পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের অধিক উর্দ্ধে না উঠিলেও কপালের উপরিভাগে কতকটা টাক পড়িয়াছে ও চুলগুলি শাদা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার বিশাল বপুখানির ওজন প্রায় সার্দ্ধ দুই মণ হইবে। তাঁহার ভারে আরব ঘোড়ারও গলদঘর্ম্ম হওয়া বিচিত্র নয়। স্থূল গ্রীবা প্রশস্ত স্কন্ধের মধ্যে লুপ্তপ্রায়, 'দোতালা' থুতনী যেন বক্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। তাঁহার ভুঁড়িটি বৃহৎ ও উরুদেশ ষণ্ডের উরুর মত স্থূল। বাদামি মুখ, বড় নাক, পুরু ঠোঁট, দাড়ী যৎসামান্য এবং চোখের ভ্রূ পাতলা। তাঁহার চক্ষুদ্বয়ও দেহের অবশিষ্টাংশের সহিত যেন মিল রাখিবার জন্য, হাতীর চোখের মত সরু ও শান্ত। মুখের উপর সদাই একটু মৃদু হাস্য লাগিয়া থাকাতে তাঁহাকে বেশ একটু রসিক-গোছ দেখাইত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শরৎ কালে, জেনারেল এক পাহাড়ে-

জায়গায় শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সাধারণ পোশাকেই সজ্জিত ছিলেন। এক ক্ষুদ্র কুটীরে এক বৃদ্ধা বাস করিত। তাহার নিকট তিনি চা প্রার্থনা করাতে বৃদ্ধা খুব মনোযোগের সহিত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল, এবং তারিফ করিয়া বলিল—"তুমি ত খুব জোয়ান! কিছু শিকারটিকার করেছ না কি?"

জেনারেল ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"না কিছু না।"

"শিকার করে কি কখন পেট চালান যায় বাপু! তোমার মস্ত শরীর নিয়ে যদি দিন-মজুরের কাজ কর ত নিশ্চয় তুমি পঞ্চাশ 'ইয়েন' * উপায় করবে।"

"মাসে?"

"না, না! এক বছরে অবিশ্যি। কাজ আরম্ভ কর। যখন বলবে আমি তোমাকে একটা কাজ দেব।"

"ধন্যবাদ! আর এক দিন এসে তোমার পরামর্শ নেব।"

"হ্যাঁ, তাই এসো বাছা। ভুলোনা। এমন প্রকাণ্ড শরীরটা শিকার করে বেড়িয়ে নষ্ট কোরো না।"

এই হাস্যকর ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদের চিত্ত-বিনোদন করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার সহিত যাহার পরিচয় নাই সে হয়ত তাঁহার সম্বন্ধে এই বৃদ্ধারই মতো মত প্রকাশ করিত। কিন্তু তাঁহাকে যে ভাল-রকম জানিত, সে বুঝিত, বিপদের সময়ে এই আত্ম-নির্ভরপরায়ণ যোদ্ধা একটি সজীব লৌহ-প্রাচীরের মত। তাঁহার ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড শরীর এবং দেবতার মত অচঞ্চল ভাব আসন্ন বিপদের সম্মুখে কম্পমান সৈন্যদলের মন হইতে ভয়-ভাবনা দূর করিয়া দিত।

* এক ইয়েন প্রায় ১৸৴০

নিকটস্থ টেবিলে একটি নীলবর্ণ আধারে এক ঝাড় সরল "বাম্বু" বাঁশ। দেয়ালের উপর দিকে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ছবি টাঙানো। তন্নিম্নে অপর দিকে একখানি কাঠের ছোট পিঁড়ি; উহার উপর নান্‌যু-লিখিত দুইটি অক্ষর; উহাদের অর্থ—"দয়ালু হও।" বইয়ের সেল্‌ফে কয়েক থাক পুস্তক। আগুনের চুল্লীর উপরকার তাকে এবং ঘরের কোণে স্থিত তেপায়ার উপর জাপানী ও বিদেশী প্রায় অর্দ্ধ ডজন ফোটোগ্রাফ; ছবিগুলির মধ্যে কেহ কেহ সৈনিকের সাজে সজ্জিত।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণের ছয়টি জানালাই সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত, সবুজ পরদা-গুলি একধারে গুটানো আছে। পূর্ব্বদিকে তানিমাচির জনাকীর্ণ রাস্তার উপর দিয়া পত্রাচ্ছাদিত রেইনাল পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। উহার উপরে আতাগো বুরুজের চূড়া ঈষৎ মাথা তুলিয়াছে। একটি চিল উহার উপরে ঘুরপাক খাইতেছিল। দক্ষিণে পুষ্পিত বাদাম বৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন একটি উদ্যান। গাছগুলির মধ্যেকার ফাঁক দিয়া হিকাওয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে সবুজ বর্শার মত একটি ঝাউ গাছ দেখা যাইতেছিল।

জানালার মধ্য দিয়া নবীন গ্রীষ্মের আকাশ নীলবর্ণ সাটিনের মত দেখাইতেছিল। তরুণ পত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে স্তবকে স্তবকে ফিকা জরদা রঙের বাদামের ফুল প্রচুর ফুটিয়া আকাশের নীলিমার উপর যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। একটি শাখা জানালার নিকট উপগত হইয়া রহিয়াছে। সংহত সূর্য্যালোক উহার পত্রাবলীর মধ্য দিয়া মরকত, নীলোৎপল ও তৃণমণির দীপ্তিতে প্রকাশিত হইতেছিল। বাতাসের ঈষৎ স্পন্দন অজ্ঞাতসারে কক্ষমধ্যে সৌরভ বহন করিয়া আনিতেছিল, ও জানালা হইতে নীলাভ পাণ্ডুরবর্ণ ছায়া জেনারেলের বাম হস্তে ধৃত "সাইবিরীয় রেল পথের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক পুস্তিকার পাতার উপর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। অপ্রশস্ত চক্ষু দুটি মুহূর্ত্তের জন্য

বন্ধ করিয়া তিনি নিশ্বাস টানিলেন। তারপর ধীরে ধীরে চাহিয়া পুস্তিকার উপর দৃষ্টি ফিরাইলেন।

বাহিরে কোথায় বল গড়ানোর শব্দের মত কূপের কপিকলের শব্দ হইল। শীঘ্রই সে শব্দ থামিয়া গেল। অপরাহ্নের নিস্তব্ধতা এক্ষণে সারা বাড়ীতে বিরাজ করিতে লাগিল। এমন সময় দেখা গেল দুইটি শিশু চুপে চুপে বাড়ীতে প্রবেশের সুবিধা খুঁজিতেছে।

ঈষদুন্মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া তাহারা গোপনে মস্তক প্রবিষ্ট করাইয়া আবার বাহির করিয়া লইল। তারপর বাহিরে চাপা হাসির শব্দ শুনা গেল। তাহাদের মধ্যে একটি অষ্টমবর্ষীয় বালক, নাবিকের পোশাকে সজ্জিত। অপরটি বালিকা, তাহার চেয়ে দুই তিন বৎসরের ছোট হইবে। তাহার মস্তকের কেশ ভ্রূর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার পরিধানে বেগুনে রঙের আঁজিকাটা পোশাক ও লাল কোমরবন্ধ।

দুইজনে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিল, তারপর যেন আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া দুয়ার খুলিয়া ফেলিয়া কক্ষ মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। রাশীকৃত কাগজের দুর্গ সহজেই উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা একেবারে জেনারেলের চেয়ার আক্রমণ করিল; দক্ষিণ দিক হইতে বালক এবং বাম দিক হইতে বালিকা বিপুলকায় যোদ্ধার হাঁটু দুটি দখল করিয়া বলিল, "বাবা!"

জেনারেল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইস্কুলের ছুটি?" ভারী হাত দিয়া তিনি পুত্রের পিঠ ও কন্যার চূর্ণ কুন্তল থাবড়াইতে লাগিলেন।

"পরীক্ষা কেমন হ'ল? ভাল?"

"বাবা আমি অঙ্কে ফার্ষ্ট হয়েছি।"

"বাবা, মাষ্টারমশায় বল্লেন, আমার সেলাই ভালো হয়েছে।"

বালিকা কিণ্ডারগার্টেনের কাজ বাহির করিয়া পিতার হাঁটুর উপর রাখিল।

"বাঃ বেশ হয়েছে!"

"আর পড়াতে আর লেখাতে সেকেণ্ড হয়েছি, বাদ বাকী সবেতে থার্ড। শেষে আমি মিনাকামির কাছে হেরে গেলুম! ভারি কষ্ট হচ্ছে!"

"আচ্ছা, লেগে থাক, পরে আরো ভাল হবে। আজ কি গল্প পড়া হ'ল?"

বালক হৃষ্টচিত্তে বলিল, "মাসাৎসুরার গল্প বাবা! আমার মাসাৎসুরাকে খুব ভাল লাগে। আচ্ছা বাবা, মাসাৎসুরা বড় না নেপোলিয়ান বড়?"

"দুজনেই বড়।"

"বাবা, আমি মাসাৎসুরাকে ভালবাসি, কিন্তু নৌ-বিভাগ আরো ভালবাসি। বাবা, তুমি হ'লে স্থল-সৈন্যের মধ্যে, আর আমি হব নৌ-সেনা।"

জেনারেল হাস্য করিলেন। "তাকেও-সানের অধীনস্থ নাবিক হবে?"

"সে, সে ত 'এনসাইন'! আমি চাই লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল হ'তে।"

"নৌ-বিভাগে ত তা বলে না। 'রীয়ার আডমিরাল' বলে। তুমি আডমিরাল হতে চাও না?"

"কিন্তু তুমি যে বাবা 'লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল'। আচ্ছা বাবা 'লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল' ত এনসাইনের চেয়ে বড়, কেমন?"

"এনসাইন-ই হোক আর জেনারেল-ই হোক যে বেশী লেখাপড়া করে সে-ই সব চেয়ে বড়।"

"বাবা, বাবা, ও বাবা", বালিকা পিতার হাঁটুর উপর লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "মাষ্টার মশায় আমাদের এমন সুন্দর গল্প বলেছেন—

খরগোস আর কচ্ছপের গল্প! গল্পটা তোমায় বলব? এক সময়ে একটা খরগোস ও একটা কচ্ছপ ছিল—এই যে মা আসচে!"

ঘড়ীতে যেই দুইটা বাজিল, অমনি প্রায় চল্লিশবৎসর বয়স্কা একটি স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিল। বিদেশী ধরণে তাহার চুল বাঁধা। সামনের চুল কুঞ্চিত এবং উঁচু কপালের উপর সিঁথি কাটা। ট্যারা বৃহৎ চক্ষু দুটি তাহার রুক্ষ মেজাজের পরিচয় দিতেছিল। ঈষৎ কৃষ্ণাভ মুখ সামান্য রঞ্জিত এবং দাঁতগুলি যতদূর সম্ভব মার্জ্জিত। পরিধানে তার জাঁকালো ক্রেপের পোশাক, কালো সাটিনের কোমরবন্ধ এবং অঙ্গুলিতে মূল্যবান অঙ্গুরীয়।

"তোমরা আবার তোমাদের বাবাকে বিরক্ত করচ!"

"না না, তা কেন হবে, আমি ওদের ইস্কুলের পড়ার কথা জিজ্ঞেস করছিলুম। আচ্ছা, এইবার 'বাবা' পড়বে! তোমরা খেলা করগে। এর পরে আমরা সকলে মিলে বেড়াতে যাব। কেমন?"

বালিকা বলিল, "কি মজা!"

বালক চীৎকার করিয়া উঠিল—"বানজাই!"

বালকবালিকা হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল। দুরে "বানজাই", "কি-চান আমায় দাও" প্রভৃতি চীৎকার শুনা যাইতে লাগিল।

"তুমি যা-ই বল, তুমি তোমার ছেলেদের বড় আদর দাও।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া জেনারেল বলিলেন, "না, ঠিক তা নয়। কিন্তু ছেলেপুলেদের ভালবাসলে তাদের উন্নতি হয় ভালো।"

"কিন্তু তুমি ত জানই যে 'কঠোর পিতা ও দয়াবতী মাতা,'— সাধারণ লোকেও এই ধারণার বশবর্ত্তী। কিন্তু তুমি তাদের যে রকম আদর দাও তাতে কথাটা উল্টে গেছে। আমাকেই সব সময়ে তাদের শাসন কর্ত্তে হয়। আমি-ই কেবল বদনামের ভাগী হয়েছি!"

"যাক, আমাকে ভর্ৎসনা করবার দরকার নেই। আর তুমিও একটু ঠাণ্ডা হও। মাষ্টার মশায় এখন দয়া করে একটু বসুন", বলিয়া হাস্য করিতে করিতে টেবিল হইতে জেনারেল একখানি পুরাণো 'রয়েল থার্ড রীডার' তুলিয়া লইলেন এবং ধীরে ধীরে বিকৃত উচ্চারণে ইংরেজি পাঠ করিতে লাগিলেন।

রমণী মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে ভুল সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল।

ইহাই জেনারেলের প্রাত্যহিক পাঠ। ১৮৬৮ সালে প্রাচীন রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় যোদ্ধারূপে উন্নীত হইয়া তিনি এমন গুরুতর কার্য্যের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন যে, বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবার আর অবকাশ ছিল না। এই গত বৎসর কেবল তাঁহাকে রক্ষিত সৈন্যদলভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে যে কয়েক ঘণ্টা অবকাশ পাইলেন তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরেজি পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। শিক্ষকের জন্য ভাবিতে হয় নাই, সিঙে ঠাকুরাণী হাতের কাছেই ছিলেন। তিনি এক বিখ্যাত 'চোষু-সামুরাই'এর কন্যা। তিনি এত দিন লণ্ডনে বাস করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মত ইংরেজি ভাষায় পণ্ডিত জাপানে পাওয়া দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য ভাবে তিনি এত দূর অনুপ্রাণিত ছিলেন যে, সেই সুদূর দেশে যেমন দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে তিনি স্বীয় সংসার চালাইতে চাহিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ভৃত্যেরা তাঁহার ঘরকন্নার কাজে অনভিজ্ঞতা দেখিয়া গোপনে হাসা-হাসি করিত, এবং ছেলে মেয়েরা তাঁহার ছায়া মাড়াইত না। তাহারা কেবল তাহাদের সদাশয় পিতার পাছে পাছেই ঘুরিত। এই-সব ভুল, এবং তাঁহার স্বামীর প্রাচ্যজনোচিত ঔদার্য্য—তিনি ছোট খাটো বিষয়ে মাথা ঘামাইতেন না—সদাই যেচোরীর মেজাজ বিষম বিগড়াইয়া দিত।

জেনারেল অনেক কষ্টে এক পাতা পড়া শেষ করিলেন। উহা অনুবাদ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দ্বার খুলিয়া একটি ফুটফুটে পঞ্চদশ-বর্ষীয়া বালিকা ঘরে প্রবেশ করিল। তার চুলগুলি লাল ফিতা দিয়া বাঁধা। প্রকাণ্ড হাতে একখানি ছোট বই ধরিয়া পিতাকে ছাত্রের মত নিরীহভাবে পাঠ করিতে দেখিয়া সে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও হাসিয়া ফেলিল ও কহিল, "মা, কাতো-মাসীমা বৈঠকখানায় বসে আছেন।"

"তাই না কি ?" বলিয়া ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি জেনারেলের কথার অপেক্ষায় রহিলেন।

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া জেনারেল দাঁড়াইয়া উঠিয়া পার্শ্বে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তাঁকে এখানে নিয়ে এস।"

প্রায় পঁয়তাল্লিশ-বর্ষীয়া এক সুশ্রী রমণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া "শুভ অপরাহ্ণ" জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার চোখে নীল চশমা ; কারণ বোধ হয় দৃষ্টিশক্তির অপ্রাখর্য্য। তাঁহাকে দেখিতে কতকটা নানি-স্রানের মত। ইহার কারণও ছিল। তিনি জেনারেল কাতাওকার প্রথমা স্ত্রীর ভগ্নী। লর্ডস্ মহাসভার সভ্য ভাইকাউণ্ট কাতোর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনিই স্বামীর সহিত, তাকেও ও নানির বিবাহে ঘটকতা করিয়াছিলেন।

জেনারেল সহাস্তে তাঁহাকে একখানি চেয়ার দিলেন ; সম্মুখের জানালার ছোট পর্দাখানি টানিয়া দিয়া কহিলেন, "বসুন, অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনার স্বামী খুব ব্যস্ত বোধ হয় ?"

"হ্যাঁ, ব্যস্ত বলে' ! তিনি ঠিক মালির মত, সব সময়ে কাস্তে হাতে ঘুরচেন। 'আইরিস' যদিও এখনো ফোটেনি কিন্তু তাঁর আদরের ডালিম গাছে খুব ফুল ফুটেছে ; আর গোলাপও ফুটেছে। একদিন

দেখতে আসবেন।” (কাতাওকা গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া) “তিনি বিশেষ-করে আপনাকে আসতে বলতে বলেছেন। কি-চান আর মি-চানকেও সঙ্গে আনবেন।”

ঠিক কথা বলিতে কি ভাইকাউণ্টেস কাতো-গৃহিণীকে বিশেষ পছন্দ করিতেন না। শিক্ষা ও প্রকৃতির পার্থক্যের জন্য তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব ছিল। তদুপরি তিনি যে স্বামীর প্রথমা পত্নীর ভগ্নী, এ-চিন্তা ভাইকাউণ্টেসের মনে উদিত হইয়া বিষম অস্বস্তি সৃজন করিত। তিনি জেনারেলের হৃদয়ের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন এবং সংসারে সম্রাজ্ঞীর মত শাসনদণ্ড পরিচালনে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এই যে পূর্ব্বপত্নীর ভগ্নীটি, ইনি কেবল যে জেনারেলের সম্মুখে যে গিয়াছে তাহার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হইতেন তা নয়; কিন্তু গোপনে নামি ও ধাত্রী ইকুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে অতীত দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন, এবং নানা প্রকারে মৃতের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া যেন প্রাধান্যের জন্য যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইতেন। ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। এক্ষণে নামি ও ইকু যাওয়াতে পূর্ব্বাধিকার-স্বত্ব অপসারিত হইয়াছে, তিনি খুব তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু যখনি তিনি কাতো-গৃহিণীর মুখ দেখেন তখনি মনে হয় যেন মৃত তার কবর ছাড়িয়া স্বামীর জন্য, গৃহিণীপনার জন্য, এবং তিনি বহু যত্নে সংসার পরিচালনের যে-সব উপায় স্থির করিয়াছেন সে-সবার জন্য, তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে আসিয়াছে।

কাতো-গৃহিণী রেশমের থলি হইতে কিছু মিষ্টান্ন বাহির করিলেন।

“কি-চান ও মি-চানকে আমার ভালবাসা জানাবেন। এখনো ইস্কুলের ছুটি হয়নি না কি? তাদের দেখতে পাচ্ছি না ত? ও, ভালো কথা মনে পড়েচে;—(চা লইয়া আগত লাল-ফিতা-পরা

মেয়েটিকে একটি কৃত্রিম খোঁপার ফুল দিয়া) কোমা-সানকে ভালবাসার সহিত দিলুম।"

"ওদের সকলের হয়ে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওরা ভারী খুসী হবে," এই কথা বলিয়া কাতাওকা-গৃহিণী মিষ্টান্নগুলি টেবিলের উপর রাখিলেন। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"রেড ক্রশ সোসাইটী"র লোক আসিয়াছে, কর্ত্রীর সহিত দেখা করিতে চায়। তিনি তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বাহিরে গিয়া মেয়েটিকে ইসারা করিয়া ডাকিয়া তার কানে কানে কি বলিলেন। তারপর বারান্দা দিয়া বৈঠকখানা অভিমুখে চলিয়া গেলেন। মেয়েটি চুপে চুপে আসিয়া যেখান হইতে ঘরের কথা শুনা যায় এমন স্থানে পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইল।

লাল-ফিতা-বাঁধা কোমা প্রথমা পত্নীর কন্যা। নামিকে ভাল না বাসিলেও ভাইকাউণ্টেস তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি শান্ত চুপ-চাপ স্বল্পবাক্ নামিকে একগুঁয়ে বলিয়াই জানিতেন। কনিষ্ঠা ভগ্নীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তাহার উদ্ধত স্বভাব তাঁহার স্বভাবের সহিত বেশ মিল খাইত। নামির প্রতি প্রকারান্তরে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার জন্য, এবং বিমাতাও সপত্নী-সন্তানের প্রতি কত সদয় হইতে পারে তাহা জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত করিবার জন্য, স্বামী যেমন নামিকে আদর করিতেন, তিনিও তেমনি কোমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। একগুঁয়ে লোকের স্বভাব কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করা; কিন্তু সাধারণত সে পরের ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় না। অন্যে তাহাকে ভাল বলুক ইহা সে সর্ব্বদা ইচ্ছা করে, এবং যাহাতে নিজের লাভ এমন কাজ করিতে তাহার বিরাম থাকে না। তাহার মত খোসামোদ-প্রিয় আর কেহ নয়। কাতাওকা-গৃহিণী মার্জ্জিতরুচি-তেজস্বিনী রমণী। যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ স্বামীর সহিত তর্কে সর্ব্বদা তাঁহার জয় হইত। কিন্তু স্বামী যেখানে যাইতেন সেইখানেই বন্ধু লাভ করিতেন; আর তাঁহাকে সকলেই

বর্জ্জন করিত। সেইহেতু যাহারা তাঁহার পাশে পাশে ঘুরিত তাহাদের তিনি স্নেহ করিতেন। সরল সাধাসিধে প্রকৃতির ভৃত্যেরা একে একে বিতাড়িত হইল, তাহাদের স্থান অধিকার করিল যত-সব ভণ্ড, মুখমিষ্ট লোকেরা। কোমাসানের, ভগ্নীকে ভাল না বাসিবার কোনো কারণ ছিল না; কিন্তু যখন সে বুঝিল বিমাতা তাহার মুখে নামির নিন্দা শুনিতে ভালবাসেন, তখন সে মিথ্যা-অভিযোগ-করা এই মন্দ অভ্যাসটি অর্জ্জন করিল। এইহেতু কখনো কখনো সে ইকুর বিরক্তিভাজন হইত। কোমার এই স্বভাব ভাইকাউণ্টেসের কাজে লাগিয়াছিল। নামির বিবাহের পরও তিনি বর্ত্তমান ঘটনার মত ছোট ছোট কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিতেন।

পূর্ব্বদিককার বারান্দার দ্বিতীয় জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া কোমা এক বার পিতার ভাঙ্গা গলার হাসি ও এক বার মাসীমার মধুর হাসি শুনিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই কণ্ঠস্বর মৃদু হইয়া আসিল, কথাগুলো অস্পষ্ট হইয়া গেল। যতই 'শাশুড়ী', 'নামি-সান' প্রভৃতি কথাগুলো জানালা দিয়া অস্পষ্টভাবে শোনা যাইতে লাগিল, লাল-ফিতা-পরা মেয়েটি ততই মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল।

"মহাদেশ হ'তে আসে ঐ আসে
লক্ষ অরাতি-সৈন্য,
নির্ভয় তবু কামাকুরাবাসী
বীরের অগ্রগণ্য।"

এই গানটি গাহিতে গাহিতে আগত বালকের দৃষ্টি বারান্দায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা কোমার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মুখ ঢাকিয়া, মাথা নাড়িয়া, তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, তাহাকে বুঝাইবার নানা চেষ্টা সত্ত্বেও সে 'কোমা-চান' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া অগ্রসর হইল, এবং সে কি করিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিল।

সে তখনো তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বহুসংখ্যক 'কি' দ্বারা বিরক্ত হইয়া অজ্ঞানতাবশত উচ্চকণ্ঠে 'দুর' বলিয়া ফেলিল। পরক্ষণে এই অকাল দুর্ঘটনায় ঘাড় কাঁপাইতে কাঁপাইতে সে-স্থান হইতে দ্রুতপদে চম্পট দিল।

"ওরে চোর!" বলিয়া বালক পিতার পাঠাগারে গমন করিল। মাসীমাকে দেখিয়া সহাস্যে অভিবাদন করিয়া একেবারে পিতার হাঁটুর কাছে গিয়া হাজির হইল।

"বাবা কি-চান্ যে! তুমি, গত বারে যা দেখেছিলুম, তার চেয়ে ঢেঙা হয়েছ দেখচি। রোজ স্কুলে যাচ্ছ? ইস্কুলে গিয়েছিলে? অঙ্কে কাষ্ট হয়েছ? বেশ! বাবা আর মার সঙ্গে মাসীমার বাড়ী এসো, কেমন?"

"মিচি কোথায়? এই দেখ মাসীমা তোমার জন্যে কি এনেছেন! এ তুমি ভালবাস, কেমন?"

কেকখানি তাহাকে দিয়া জেনারেল বলিলেন, "তোমার মা কোথায়? এখনো বৈঠকখানায়? তাঁকে বল মাসীমা যাচ্ছেন।"

শিশুটি যাইতেছে দেখিয়া আগন্তুকের প্রতি চিন্তান্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া জেনারেল কহিলেন, "তাহলে ইকুর বিষয়টা নিশ্চয় স্থির করবেন। এই রকমই যে ঘটবে এ আমি প্রথমেই ভেবেছিলুম। আমি তাকে পাঠাতুম না, কিন্তু নামি আর তাঁরও ইচ্ছানুসারেই পাঠিয়েছিলুম। হ্যাঁ, ঠিক। আমার কথাটা এখন বুঝতে পেরেছেন?"

কাতাওকা-গৃহিণীর আগমনে কথোপকথনে বাধা পড়িল। তিনি কাতোঠাকুরাণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এখুনি চল্লেন? একটি লোক আসাতে উঠে যেতে হয়েছিল। এইমাত্র তিনি গেলেন। আবার সেই 'চ্যারিটি বাজারের' কথা। এতে কিছু হবে বলে ত বিশ্বাস হয় না। একান্তই যাবেন? চিজুকোসানকে আমার ভালবাসা দেবেন। নামি গিয়ে পর্য্যন্ত ভারী তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়।"

"তার শরীর ভাল নেই। তাই অনেক দিন দেখা করতে আসে নি। নমস্কার!"

"নমস্কার!"

জেনারেল কহিলেন, "চলুন খানিকটা আপনার সঙ্গে যাই। এই একটুখানি। কী, মী—তোমরাও এস, এইবার বেড়িয়ে আসা যাক।"

বৈঠকখানার একখানা আরাম-কেদারায় কাতাওকা-গৃহিণী বসিলেন ও 'চ্যারিটি-বাজারের' অনুষ্ঠানপত্র উল্টাইতে উল্টাইতে কোমাকে মাথা নাড়িয়া ডাকিলেন।

"কোমা-সান, কি বিষয়ে কথা হচ্ছিল?"

"ভালো করে শুনতে পেলুম না, মা। কিন্তু ইকুর সম্বন্ধে কিছু।"

"ইকু?"

"হ্যাঁ, এই রকম। তাকেও-সানের বুড়ো মার বাত হয়েচে ও তিনি খুব খিটখিটে হয়েছেন। ইকু একদিন নামি-সানের সঙ্গে তার ঘরের ভিতর কথা কইছিল। সে বল্লে 'বুড়ি এত খিটখিটে হয়েছে কেন? তা ঠাকরুণ ভেবোনা, বুড়ীর বয়েস হয়েচে, আর মরতে দেরী নেই।' ইকুর এমন কথা বলা আহাম্মকি নয় মা?"

"কুঁদুলে বুড়ীটা সদাই গোল বাঁধিয়ে বেড়াচ্ছে!"

"আর ঠিক সেই সময়ে বুড়ী ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইকুর কথা সব শুনলে। শুনে খুব রেগে উঠলো।"

"দেখ! আড়ি-পেতে শোনবার ফল!"

"সে এত রেগেছিল যে নামি-সান কি করবে ভেবে না পেয়ে কাতো-মাসীমার কাছে গিয়েছিল।"

"মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে?"

"নামি-সান কথায় কথায় মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে যায়।"

রমণী শুষ্ক হাসি হাসিলেন।

"আর কি ?"

"তারপর বাবা বল্‌লেন ইকুকে পল্লীভবন তদ্বির করতে পাঠাবেন।"

রমণী উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন, "তাই না কি ? আর কিছু নয় ?"

"আমি আরো শুনতুম কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কি-চান এসে পড়্‌লো, আর—।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শাশুড়ী

তাকেওর মাতার নাম কেই। তাঁহার বয়স তিপ্পান্ন, স্বাস্থ্য খুব ভাল, প্রায়ই বাতে কষ্ট পান—এই যা। শোনা যায় বাড়ী হইতে তাঁহার স্বামীর সমাধিভূমি, প্রায় দশ মাইল পথ, তিনি অনায়াসে পদব্রজে যাইতেন। ওজনে তিনি প্রায় দুই মণ ছিলেন। ভদ্রমহিলা-দিগের মধ্যে কেহই এ বিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বামী মিচিতাকের মৃত্যু ঘটে। তাহার পর হইতেই তিনি স্থূল হইতে আরম্ভ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্যাঁকাটির মত কৃশ ও বিবর্ণ ছিলেন। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিত যে তিনি একটি রবারের বল বিশেষ, উপর হইতে চাপ যেমন সরিয়া গিয়াছে অমনি ফুলিয়া উঠিয়াছেন!

তাঁহার স্বর্গীয় পতি কাগোশিমা গণান্তর্গত একজন সামান্য সামুরাই ছিলেন। বিবাহের সময় অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। পুরাতন রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাহার পর ওকুবো-মন্ত্রিসভার অধীনে দীর্ঘকাল স্থানীয় শাসনকর্ত্তার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য ভাইকাউন্ট

ক্কাতো ও আর কয়েকজন ব্যতীত সকল সহকারীরই সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটিয়াছিল। ওকুবোর পতনের পর তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা পান নাই। লোকে বলিত যে তিনি ভাগ্যক্রমে কাওোশিমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্যারন হইতে পারিয়াছিলেন; নচেৎ তাঁহার অন্য কোন গুণই ছিল না। রুক্ষমেজাজ একগুঁয়ে মিচিতাকে মদ্যপানে নিজের দুর্নিবার অসন্তোষ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। পাঁচ পাত্র আন্দাজ 'পার' করিয়া যখন তিনি বুক ফুলাইয়া দৈত্যের মত লাল মুখ লইয়া স্থানীয় সভার সম্মুখে দাঁড়াইতেন, তখন কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না।

তাঁহার পরিবারের মত অসুখী পরিবার বড়-একটা দেখা যাইত না। বাড়ীটি যথেচ্ছাচারে শাসিত হইত। ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রের মাঝে দীর্ঘ তরুতলে পথিকের অবস্থা যেমন এ পরিবারটির অবস্থাও তেমনই অরক্ষিত ছিল। একমাত্র তাকেও-ই কেবল বাল্যকালে পিতার কোলই নৃত্যের উপযুক্ত স্থান এবং তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলার সাথী বলিয়া জানিয়াছিল। সে ছাড়া সকলেই—গৃহিণী, ভৃত্যগণ, এমন কি বৈঠকখানার থামগুলো পর্য্যন্ত প্রভুহস্তদত্ত বেদনার সহিত সুপরিচিত ছিল। যে-য়্যামাকি এখন "ভদ্র ব্যবসায়ী" রূপে পরিচিত, সে-ও এ দান হইতে একেবারে বঞ্চিত ছিল না। কিন্তু সেজন্য সে কখনো কাওয়াশিমা পরিবারে যাতায়াত বন্ধ করে নাই। কারণ সে জানিত মিচিতাকের সন্তোষ বা অসন্তোষে তাহার যে লাভ হইবে তার তুলনায় এ মাশুলটা অতি সামান্য।

যখন গুজব উঠিত কর্ত্তা চটিয়াছেন, তখন রান্নাঘরের ইঁদুরটাও তার "কুর কুর" শব্দ থামাইত। বাড়ীর অভ্যন্তর হইতে অতর্কিত অশনিপাতের মত যখন তাঁহার ক্রোধকম্পিত কণ্ঠস্বর শুনা যাইত,

তখন নির্জ্জীব ভৃত্যের হস্ত হইতে বাসন-কোসন খসিয়া পড়িত। শোনা যায় অধীন কর্ম্মচারীরা যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তখন তাহারা ভৃত্যদের নিকট হইতে বাতাস কোন্ দিকে বহিতেছে সে কথা পূর্ব্বাহ্ণেই জানিয়া লইত।

এহেন স্বামীর সহিত কেই-ঠাকুরাণী প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কতটা সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা একবার ভাবুন! পতির পিতামাতা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহাদের স্বভাবের তুলনায় পতির স্বভাব বিশেষ অসাধারণ বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু যখন তাঁহাদের দুইজনেরই পরে পরে মৃত্যু হইল, তখন পতির প্রকৃত মূর্ত্তি সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িল। তখন হইতে তাঁহার ধৈর্য্যগুণের পরীক্ষার আর অন্ত রহিল না। প্রথম প্রথম তিনি অল্পসল্প বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলেন তাহাতে কোনো ফল নাই। অতঃপর আর তিনি সাহস দেখাইতেন না। হয় বুদ্ধিমতীর মত ঝড়ের বেগে নত বেণুদণ্ডের মত সব সহিয়া যাইতেন, নয় নিরাপদ হইবার যা শ্রেষ্ঠ উপায় তাহাই করিতেন, অর্থাৎ চম্পট দিতেন।

ইতিমধ্যে স্বামীর ক্রোধের স্রোত ফিরাইবার উপায় তিনি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তিনবার চেষ্টা করিয়া অন্তত একবার কৃতকার্য্যও হইতেন। কিন্তু স্বামীর স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। জীবনের শেষ তিন চার বৎসর তিনি মদ্যপানোদ্দীপ্ত ক্রোধে এমন উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন যে, কেই-ঠাকুরাণী তাঁহার বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও স্বীয় দুর্ভাগ্য জীবনের দারুণ দুঃখ নূতন করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। প্রিয় পুত্র তাকেও এবং স্বীয় শুভ্র কেশের কথা ভুলিয়া প্রায়ই তিনি ভাবিতেন যে, ব্যারনের ও শাসনকর্ত্তার গৃহিণী হওয়ার চেয়ে দরিদ্র মজুর-কৃষকের

গৃহিণীর শান্তিময় জীবন অধিকতর বাঞ্ছনীয়! কিন্তু সময় তীরের মত দ্রুত গতিতে চলিয়া গেল। যখন তিনি দেখিলেন, তাঁর হৃদয়হীন স্বামীর কঠিন মৃতদেহ বাক্সের মধ্যে ঊর্দ্ধমুখে শায়িত রহিয়াছে তখন তাঁহার বিবাহিত জীবনের ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। তিনি একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন—কিন্তু তবুও হতভাগিনীর গণ্ড বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল।

তিনি কাঁদিলেন বটে, কিন্তু এতদিনে তাঁহার ভাবনা দূর হইল। স্বাধীনভাবে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত শক্তি কতকটা তিনি ফিরিয়া পাইলেন। স্বামীর জীবিত অবস্থায় সেই বিপুলকায় উচ্চকণ্ঠ লোকটির পাশে তাঁহার অস্তিত্ব একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু এখন কোণ হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র তিনি ফাঁপিয়া ফুলিয়া সে বাড়ীর গৃহিণীর উপযুক্ত আয়তন লাভ করিলেন। স্বামীর পার্শ্বে যাহারা তাঁর ভীরুতা লক্ষ্য করিয়াছিল তাহারা বলিল, পরিবর্ত্তনটা অদ্ভুত হইয়াছে।

জনৈক পণ্ডিতের কিন্তু মত যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী স্ত্রী আকৃতি ও প্রকৃতিতে ক্রমশ এক হইয়া দাঁড়ায়। সত্য মিথ্যা যাহাই হৌক তাকেওর মাতা সম্বন্ধে বাস্তবিকই এ কথা খাটিত। তাঁহার আকৃতি ব্যবহার অভদ্রতা সর্ব্বোপরি তার রুক্ষ স্বভাব মৃত স্বামীর একেবারে হুবহু নকল হইয়া উঠিয়াছিল।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া যাঁহার সহিষ্ণুতার পরীক্ষা চলিতেছিল সেই কাওয়াশিমা-গৃহিণী ভাবিলেন, এইবার তাঁহার দিন আসিয়াছে। স্বামীর মৃতদেহ বাক্সে বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সকল সহিষ্ণুতার বন্ধন একেবারে খুলিয়া দিলেন। যাহাকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করিতেন সে তো চলিয়া গিয়াছে! আর তার ঘৃণ্য হস্ত তাঁহাকে আঘাত করিবে না! তিনি এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন,

যেন বলিতে চান যে, এতাবৎকাল তিনি যে চুপ করিয়া ছিলেন, স্বীয় অসহায় অবস্থা তাহার কারণ নয়। বহুদিন পূর্ব্বে ধার-দেওয়া টাকার সুদ শৈথিল্যবশত সংগ্রহ হয় নাই। কর্ম্মচারীদের নিকট টাকার জন্য অতিমাত্রায় তাগিদ পাঠাইয়া তিনি যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী সে কথা তাহাদিগকে নিশ্চিতরূপে বুঝাইয়া দিলেন। স্বামী ও স্ত্রীর রোষপ্রবণতার মধ্যে প্রভেদ ছিল অনেক। মৃত ব্যারন বীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। বিরক্তিজনক হইলেও তাঁহার ক্রোধের মধ্যে এমন একটা বেগ ছিল যা দেখিলে সুখ হইত। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন স্বার্থপর সন্দিগ্ধ ও সঙ্কীর্ণমনা; অধিকন্তু পুরুষের নির্ভীকতা তাঁহার মোটেই ছিল না। সুতরাং তাঁর মেজাজ একেবারেই অসহ্য। তাঁহার আমলে ভৃত্যদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

ইনিই নামির শাশুড়ী।

বিবাহের ঠিক পরেই প্রত্যেক নববধূর একটা পরীক্ষার সময় আসে। নূতন গৃহিণী হইয়া তাহারা কি যে করিবে প্রথম প্রথম কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। বিবাহিত জীবনের আদব-কায়দা অনুসারে বধূর "মারুমাগে"* খোঁপা বাঁধা প্রয়োজন। তাহা বর্জ্জন করিয়া অন্য কোন ফ্যাশানে যদি চুল বাঁধিল অমনি কুরুমা-ওয়ালা† তাহাকে অবিবাহিতা ঠাওরাইয়া "কুমারী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া বসিল। এ ভুলটা সংশোধন করিবার যাহারি সাহস নাই সে তখন ফাঁপরে পড়িয়া যায়। পিত্রালয়ে ভৃত্যেরা তাহাকে দিদিমণি বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছিল, এখন শ্বশুরালয়ে সকলে ডাকে "কর্ত্রী ঠাকুরাণী" বলিয়া। এ সম্বোধনে সে উত্যক্ত হইয়া উঠে। তবে এ ভাব বেশী দিন থাকে না। অনতিকাল পরেই সে আপনার নূতন

---

* বিবাহিতা জাপ-নারীর কবরী

† মানুষটানা গাড়ীকে কুরুমা বা রিক্স বলে

অবস্থা বুঝিয়া লয়। প্রথম প্রথম লজ্জার অস্পষ্ট আবরণের মধ্য হইতে যে-সব ব্যাপার সামান্যমাত্র বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিল, এখন সে-সকলের আসল মূর্ত্তিটা দেখিতে পায়। নামিও এখন তাহার জীবনের এই অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছিল।

প্রত্যেক পরিবারের চাল-চলন ধরণ-ধারণ বিভিন্ন প্রকারের। নামি যখন বধূসজ্জায় সজ্জিত হইয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিল তখন তাহার পিতা আন্তরিক স্নেহের সহিত তাহাকে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছিলেন। সেগুলি তাহার ভালরকমই মনে ছিল। পিতা বলিয়াছিলেন,—"পুরাতন বাড়ীর আদর্শের সহিত নুতনের তুলনা করিয়ো না। নামি-কাতাওকা চলিয়া গিয়া তাহার স্থানে নামি-কাওয়াশিমা নামক এক নূতন মানুষ আসিয়াছে একথা কখনও ভুলিয়ো না।" নূতন গৃহে পৌছিয়া নামি দেখিল পিত্রালয়ের সঙ্গে সে বাড়ীর পার্থক্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কাওয়াশিমা-পরিবারের সম্পত্তি তাহার পিতার সম্পত্তি অপেক্ষা হয়ত অধিক। তাকেওর পিতা শাসনকর্ত্তারূপে কার্য্যকালে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এ পরিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নূতন অভিজাতবর্গের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? নামির পিতার খ্যাতি কত। তাঁহার পরিবার কত জনপ্রিয়! সে-পরিবারে সবই সূর্য্যোদয়ের মত উজ্জ্বল। কিন্তু এ বাড়ীতে সমস্তই ডোবার ন্যায় বদ্ধ নিশ্চল। এ-পরিবারের কুটুম্ব ছিল না, পরিচিতের সংখ্যাও বেশী নয়। তাকেওর পিতা বর্ত্তমানে যাহারা আসিত তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারাও আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাকেওর মাতা কাহারও সহিত মিশিতে পারিতেন না। বাড়ীর কর্ত্তা, যিনি বাড়ীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাঁহার বয়স অল্প; তিনি নিম্নপদের কর্ম্মচারী—অধিকাংশ সময়ই বাড়ীতে থাকেন না। নামির বিমাতা নূতন উজ্জ্বল সামগ্রী পছন্দ করিতেন। তিনি

গৃহিণীপনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত মিতব্যয়িতা দেখিয়া ভৃত্যেরাও কখন কখন নিন্দা করিত। কিন্তু যে যা বলুক, সৈনিকের সংস্রবে যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক, মোটের উপর নামির পিত্রালয়ে সকল সামগ্রীই সেরূপ জমকালো ও মূল্যবান। কিন্তু সে-গৃহ এবং এ নূতন গৃহের মধ্যে কত পার্থক্য! পুরাতন প্রথা ও অসভ্য গ্রাম্যরীতিগুলিকে ইহারা প্রাণপণে আঁকড়িয়া রহিয়াছে, যেন জগতে এগুলোই একমাত্র রীতি। ত্রিশ বৎসর আগে শাশুড়ী যখন এক দরিদ্র সামুরাইয়ের গৃহিণী ছিলেন তখন তাঁহার গৃহিণীপনার প্রণালী যেমন ছিল এখনও তেমনি। তখন অনিবার্য্য কারণে সকল কাজেরই বন্দোবস্ত তাঁহাকে নিজে করিতে হইত, সেই অভ্যাসটা এখন তাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। তাজাকি নামক একজন সাদাসিধে ভালমানুষ সামান্য ভৃত্যকে ভাণ্ডারী নিযুক্ত করিয়া তিনি নিজেই জ্বালানিকাঠ কয়লা প্রভৃতি প্রত্যেক খুঁটিনাটি জিনিসের মাসিক ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন! এই ত অবস্থা! এমন সময়ে ইকু পরিচারিকারূপে নামির সহিত আসিল। শাশুড়ী সবিস্ময়ে বলিলেন, এই নামজাদা পরিবারগুলোর কী চাল! আসল কথা বলিতে কি, ইকুর অসম্ভ্রমসূচক মন্তব্যে শাশুড়ীর ক্রোধই নামির শ্বশুরালয় হইতে ইকুর বিতাড়নের একমাত্র কারণ না-ও হইতে পারে।

বুদ্ধিমতী হইলেও নামি অল্পবয়স্কা। সে-যে হঠাৎ নূতন গৃহের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের চালচলনের সহিত মিলাইয়া চলিতে অক্ষম হইল ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। পিতার উপদেশের গুরুত্ব নামি ভাল-রকমই বুঝিত। সে নূতন অবস্থার স্রোতে জড়ের মত গা ভাসাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। তাহার সংকল্প-পরীক্ষা করিবার একটা সুযোগও নিকটেই ছিল।

ইকাও হইতে ফিরিবার অনতিকাল পরেই তাকেওর প্রতি

সমুদ্রভ্রমণের আদেশ হইল। নাবিকের সহিত নামির বিবাহ হইয়াছিল, সেহেতু সে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মিলনের পরই এত শীঘ্র বিচ্ছেদ সে কল্পনা করে নাই। ইহাতে তাহার হৃদয় প্রায় ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল, কিছুকাল সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

নামির সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পূর্ব্বে নামির পিতার সহিত তাকেওর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পিতা তাহাকে খুব পছন্দ করিয়াছিলেন। নামি তাঁহার কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বিবাহ করিল। ফলে সে-যে ঠিক কাজ করিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইল। সে দেখিল, তাকেও উচ্চমনা নির্ভীক পুরুষ, সরলতা তাহার মজ্জাগত এবং হৃদয় স্নেহপ্রবণ; নীচতা তাহার মধ্যে কণামাত্র নাই। সে যেন তাহার প্রিয় পিতার ক্ষুদ্র ছবি। এমন কি তাকেওর দীর্ঘ পদক্ষেপে দোলাচালে চলিবার ধরণ এবং শিশুর মত হাসি ঠিক তাহার পিতারই ন্যায়। এমন স্বামীর সহিত থাকিতে কত সুখ! নামি সমস্ত হৃদয় দিয়া স্বামীকে ভালবাসিল। তাকেওর-ও এই প্রেমময়ী পত্নীর প্রতি গভীর ভালবাসা জন্মিল। সে পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাহার মনে হইল সে একসঙ্গেই স্ত্রী এবং ভগিনী দুই-ই পাইয়াছে! সে সোহাগ করিয়া পত্নীকে তাহার নিজের প্রিয় "নামিসান" বলিয়া ডাকিত। বিবাহের পর এখনও তিন মাস অতীত হয় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহারা উভয়ে উভয়কে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, যেন তাহারা পূর্ব্ব জন্ম হইতে পরিচিত। তাই অল্প কালের জন্য হইলেও বিচ্ছেদের দুঃখ উভয়ের পক্ষেই অসহ্যপ্রায় হইয়াছিল।

নামি কিন্তু সে-দুঃখে বেশী দিন কাঁদিতে পারে নাই। তাকেও চলিয়া যাইবার পরই তাহার শাশুড়ী কঠিন বাত রোগে আক্রান্ত

হইলেন, ফলে তাঁহার স্বাভাবিক ক্রোধ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পরে ইকু পর্য্যন্ত যখন চলিয়া গেল তখন বেচারি নামির কষ্টের আর অবধি রহিল না।

নূতন 'ক্যাডেট'কে পুরাতনেরা কিছুকাল জ্বালাতন করে। কিন্তু বছর-খানেক অতীত হইলে সেই এক বৎসরের পুরাণ' 'ক্যাডেট' নবাগতদিগকে বিরক্ত করিয়া প্রচুর আনন্দ পায়। শাশুড়ী যখন বধূরূপে শ্বশুরালয়ে নূতন আসিয়াছিলেন তখনকার কষ্ট তিনি খুব ভালরকমই বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য বধূর সহিত অন্যায় ব্যবহার করা তাঁহার কখনও উচিত নয়। কিন্তু মানুষের স্বভাব এমনি দুর্ব্বল যে, যৌবনের ফুল শুকাইয়া গিয়া বধূ যখন আপনাকে শাশুড়ীর পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পায়, তখন তাহার অত্যাচারী স্বভাব মাথা তুলিয়া ওঠে এবং যে-শাশুড়ীকে সে এত ঘৃণা করিত সে নিজে ঠিক সেই রকমই একটি শাশুড়ী হইয়া দাঁড়ায়।

নামি যখন সেলাই করে তখন শাশুড়ী বলেন, "এই দেখ চওড়ায় ভুল করেছ। এটা চার ইঞ্চি করে' এই রকম করে' ঘোরাও। আঃ কী বিপদ! অমন করে' নয়। দাও দাও আমাকে দাও। অবাক ক'রলে, তুমি এ বিশ বছর ঘুমিয়ে ছিলে না কি? হুঁ, তুমি আবার গিন্নী হতে চাও!" এই কথা বলিতে বলিতে শাশুড়ীর যদি মনে পড়ে যে একদা তাঁহারই শাশুড়ী তাঁকেও এমনি মুখভঙ্গী সহকারে বিদ্রূপ ও ভৎ'সনা করিতেন, তবে হয়ত তাঁহারও একটু দুঃখ হইতে পারে। কিন্তু দুঃখ বোধ করিয়া নিজ ব্যবহার সংশোধন করিবার চেষ্টা করেন এমন শাশুড়ী বিরল। অনেকেই 'নাকের বদলে নাক' এই নীতির অনুসরণ করেন; এবং 'বুদো'র শাশুড়ী যে ক্ষতি করিয়াছে 'উদো'র স্ত্রীর উপর তার প্রতিশোধ লন। এইরূপে অজ্ঞাতসারে তাঁহারা নিজেদের জীবনে প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত

হইয়া উঠেন। নামির শাশুড়ী এই ধরণের লোক। সাহেবি-ধরণের বিমাতার অধীনে লালিত হইয়া বিবাহিত জীবনে সেকেলে-ধরণের শাশুড়ীর হাতে লাঞ্ছিত হওয়া—বেচারি নামির এমনই অদৃষ্ট! অনেক সময় নামি রোগশয্যায় শায়িতা বৃদ্ধা শাশুড়ীর কষ্টে যথার্থই দুঃখিত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে যাইত। কিন্তু এ-কাজে সে অনভ্যস্ত ছিল, তাই তাহার প্রাণপণ সেবা রোগিণীর কখনও মনঃপূত হইত না। নামিকে শাশুড়ী মুখে একবার ধন্যবাদ দিয়া পরক্ষণেই ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিচারিকাকে এমন উচ্চ বিকট স্বরে ভর্ৎসনা করিতেন যে, দশ-বৎসর-ধরিয়া-বিমাতার-ব্যঙ্গোক্তি-শুনিতে-অভ্যস্ত নামিও ভয়ে এতটুকু হইয়া যাইত। প্রথম কয়েক সপ্তাহ এইরূপ চলিয়াছিল। তারপর আক্রমণটা সোজাসুজি নামির উপরই হইতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে একমাত্র সদয় ব্যক্তি ইকুও যখন বিদায় হইল, তখন কখন কখন নামির মনে হইত, সে যেন আবার তাহার অতীত জীবনের নিরানন্দ কোণে ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যেই সে ঘরের মধ্যে গিয়া টেবিলের উপর রূপার ফ্রেমে বাঁধানো বলিষ্ঠ সৈনিকের নির্ব্বাক ছবিখানি দেখিত, অমনই নিমেষে তাহার সমস্ত ভাবনা দুর হইয়া যাইত। ছবিখানি হাতে করিয়া তুলিতে তুলিতে তাহার হৃদয় স্নেহে প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিত। প্রাণ ভরিয়া সে ছবিখানি দেখিত, চুম্বন করিত, বুকে চাপিয়া ধরিত, এবং ছবিখানি যেন শুনিতে পাইতেছে, এমনি ভাবে চুপি চুপি বলিত, "ফিরে এস, শীগ্‌গির ফিরে এস, প্রিয়তম!" প্রিয়তমের জন্য নামি হৃষ্টচিত্তে সকল কষ্ট সহ্য করিবে এবং আপনা ভুলিয়া শাশুড়ীর সেবা করিবে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কার্য্যে নিযুক্ত

হংকং, জুলাই—

প্রিয়তমা নামি,

নিরানব্বই ডিগ্রী গরমে গলদঘর্ম্ম অবস্থায় তোমায় এই চিঠি লিখচি। সাসেবো থেকে যে পত্র দিয়েছিলুম তা বোধ হয় পেয়েছ। সেখান থেকে যাত্রা করে অবধি দিনগুলো এত গরম হয়েছিল যে "অজেয় দ্বীপের" নাবিক আমরাও একটু মুসড়ে পড়েছিলুম। আমাদের কর্ম্মচারী ও নাবিকদের মধ্যে ডজন খানেক লোকের সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়েছিল, আমি কিন্তু ভালই আছি। রোগীর কামরায় আমাকে এক দিনও থাকতে হয়নি। বিশুবরেখার নিকটে ঝলসান রোদে পুড়ে আমার কালো চেহারার ওপর এমন একটি পোঁচ পড়েছে যে আমি তা দেখে নিজেই অবাক হই। আজ জাহাজ থেকে নেমে এক নাপিতের দোকানে গিয়েছিলুম, অন্তমনস্কভাবে যেই আর্শির দিকে ফিরেচি, দেখি এক নতুন লোক দাঁড়িয়ে! আমার এক রসিক বন্ধু আমার এই অবস্থার ছবি একখানা তোমার কাছে পাঠাতে বলছিল, কিন্তু আমি তা করচি না। সমস্ত পথটাই ভালোয় ভালোয় কেটেছে একবার কেবল ঝড় পেয়েছিলুম। গত কল্য আমরা এখানে নিরাপদে এসে পৌঁছেচি।

সাসেবোতে তোমার স্নেহমাখা পত্র পেয়ে বার বার সেখানি পড়েচি! মার আবার সেই পুরাণো ব্যারাম হয়েচে শুনে দুঃখিত হলুম। কিন্তু তুমি তাঁর সঙ্গে আছ বলে এ বৎসর আমি খুব নির্ভাবনায় আছি। আমার বদলে তুমি তাঁর পরিচর্য্যা কোরো।

ব্যারাম হলে তাঁর মন-যুগিয়ে চলা দায়, সেই জন্যে তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।

আশা করি আকাসাকার সকলে ভালো আছেন। কাতো মেসোর খবর কি? এখনো কাঁচি হাতে ব্যস্ত না কি? তাহলে ইকু চলে গেছে! কেন এ রকম হ'ল তা জানি না, কিন্তু এরূপ হওয়াতে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি। তাকে চিঠি লেখবার সময় আমার ভালবাসা জানিও, আর বোলো তার জন্যে আমি অনেক উপহার নিয়ে যাব। আমি তাকে ভারি ভালবাসি। সে খুব আমুদে। তুমিও বোধ হয় তার বিচ্ছেদ অনুভব করচ! কাতো মাসী ও চিজুকো-সান তোমার সঙ্গে কখনো কখনো দেখা করতে আসেন কি?

চিজিওয়া সর্ব্বদাই আসে শুনলুম। আমাদের জন কয়েক মাত্র আত্মীয়, তার মধ্যে চিজিওয়া একজন। মা তার ওপর ভারি সন্তুষ্ট। তাকে আদর করলে মা খুসি হবেন। সে বেশ চালাক চতুর লোক, দরকার হয় ত আশা করি সে তোমায় সাহায্য করবে।"

তোমার বড় স্নেহের

তাকেও

পুঃ। সঙ্গের চিঠিখানা মাকে পড়ে শুনিও। এখানে দিন কতক থাকব। এখান থেকে রসদ নিয়ে ম্যানিলা হয়ে সিড্‌নী, তার পর নিউক্যালিডোনিয়া ফিজি হ'য়ে সন্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো, তার পর হাওয়াই হয়ে বাড়ী। শরৎকালে বাড়ী পৌঁছুব আশা করি।

পুঃ। সন্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো (আমেরিকা) জাপানী বাণিজ্য দূতের নিকট,—এই ঠিকানায় চিঠি পাঠিও।

সিড্‌নী, আগষ্ট—

প্রিয়তমা নামি,

.........গত মে মাসে নামিসানের সঙ্গে ইকাওতে 'ফার্ণ' সংগ্রহ করছিলুম; আর এখন আমি দক্ষিণ গোলার্দ্ধের কত নীচে, সিড্‌নীতে! রাত্রে যখন মুখ তুলে তারাগুলোর দিকে দেখি ও গতদিনের কথা ভাবি, তখন আমাদের জগৎটা কি পরিবর্ত্তনশীল এ কথা না ভেবে থাকতে পারি না। গত বৎসর যখন সমুদ্র ভ্রমণ করতুম, কখন কখন শরীর খারাপ হত, কিন্তু আশ্চর্য্য, এ বৎসর আমি খুব ভাল আছি। এবার একটা নতুন অননুভূতপূর্ব্ব ভাব আমার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা রয়েছে। ডেকের ওপর একলা দাঁড়িয়ে যখন দেখি দক্ষিণ-দেশের অন্ধকার আকাশে অসংখ্য হীরের টুকরো ঝিক্‌মিক্ করে জ্বলচে, তখন এই ভাবটা বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠে; তখন যেন আমি চোখের সামনে তোমার সুন্দর মুখখানি দেখতে পাই! আমার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে হেসো না। বন্ধুদের সঙ্গে যখন থাকি তখন যেন কোনো ভাবনা নেই এমনি ভান করে তাদের সঙ্গে গাই "বাড়ীতে অশ্রুবর্ষণ, আমরা তাতে ভ্রূক্ষেপ করি না, কারণ সাহসের কাজ—ইত্যাদি" কিন্তু (হেসো না) নামিসানের ছবি সদাই আমার কোটের ভেতরের পকেটে রয়েছে। এই চিঠি লিখতে লিখতে আমি একজনের চেহারা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যে 'পামের' ছায়া-ঢাকা বাড়ীর ছোট ঘরটিতে এই চিঠি পড়বে।

সিড্‌নী-উপসাগরে অনেক পরিবার জল-বিহার করে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবি যে যখন কাজ-কর্ম্ম শেষ করে নামি-সান আর আমার দুজনেরই চুল পাকবে তখন আমরাও অন্তত পাঁচ হাজার টনের একখানা বড় বিহারতরণী তৈরী করাব। আমি হব সে জাহাজের কাপ্তেন আর আমাদের ছেলেরা আর নাতিরা হবে নাবিক। আমরা

সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াব। তখন আবার আমরা সিড্‌নীতে আসবো। আর বহু বৎসর আগে এক তরুণ নাবিক যে-সব স্বপ্ন হৃদয়ে পোষণ কর্‌ত সে স্বপ্নের কথা তখন তোমায় বল্‌ব।

তোমার বড় স্নেহের

তাকেও

তোকিও—

প্রিয়তম তাকেও,

হংকং থেকে ১৫ জুলাই যে স্নেহমাখা চিঠিখানি পাঠিয়েছ তা কতবার পড়েছি! এত গরমেও তুমি ভাল আছ শুনে বড় আহ্লাদিত হলুম। মা ভাল হয়ে উঠছেন, তাঁর জন্যে ভেবো না।

নিঃসঙ্গ দিনগুলো কোনো রকমে কাটিয়ে দিই। তুমি এখানে নেই, সেই জন্যে বিশেষত মাকে সুখী করতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমি বড় মুখ্যু, যতটা ইচ্ছে হয় কাজে ততটা করে উঠতে পারি কৈ! তুমি যেদিন নিরাপদে বাড়ী পৌছুবে সেদিনের জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছি।

আকাসাকার সকলে ভাল আছে। তারা জুসির 'ভিলা'তে গেছে। কাতো-রা ওকিৎসু গেছে, তোকিওতে আমরা ভারি একলা পড়ে গেছি। ইকুও জুসিতে আছে; সে ভাল আছে। তোমার ইচ্ছা তাকে জানিয়েছিলুম, সে তোমার দয়ার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ দিয়েছে।

আমি বেশ বুঝতে পারচি কতকগুলো প্রয়োজনীয় বিদ্যা আমার শেখা হয়নি। গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম শেখবার জন্যে বাবা আমায় বিশেষ করে বলতেন, তখন শিখিনি, সে জন্যে এখন অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। তোমার ইচ্ছামত ইংরেজি পড়ব মনে করেছিলুম, কিন্তু বই নিয়ে বেশীক্ষণ বসলে মা পাছে অসন্তুষ্ট হন সেই ভাবনা

হয়। তাই আপাতত গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মেই সমস্ত সময়টা দিচ্ছি। বিনা কারণে পড়াশুনো করচি না, আশা করি এ কথা ভাববে না। লিখতে লজ্জা করে, কিন্তু সময় সময় যখন খুব দুঃখ হয়, বড় একলা বোধ হয়, তখন তোমায় দেখতে এত ইচ্ছে হয় যে মনে হয় পাখীর মত ডানা থাকলে তোমার কাছে উড়ে যেতুম। তোমার আর তোমার জাহাজের ছবিই এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা। ইস্কুলে পড়বার সময় সাধারণ ভূগোলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিইনি, কিন্তু এখন একখানা কতকালের জীর্ণ, বিস্মৃত মানচিত্র বার করে তা'তে তোমার জাহাজের গম্যপথটি বার করতে কত আনন্দ হয়! কখন কখন আমার মনে হয় যদি পুরুষ হতুম, আর নাবিক হতুম, তা'হলে সকল সমুদ্রযাত্রাতেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারতুম! প্রিয়তম, আমার দুর্ব্বল চিত্তের প্রতি দয়া কোরো; আমার সকল চিন্তা তোমারই জন্যে। খবরের কাগজে এত দিন বায়ুর অবস্থা সম্বন্ধীয় বিবরণ পড়তুম না, এখন রোজ পড়ি। জানি তোমার জাহাজ যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার বায়ুর অবস্থা এরূপ নয়, কিন্তু তবুও যখনি ঝড়ের সম্ভাবনা দেখি তখনি তোমার জন্যে বড় ভাবনা হয়। খুব সাবধানে থেকো।

তোমার স্নেহের পত্নী

নামি

তোকিও, অক্টোবর——

প্রিয়তম তাকেও,

প্রতি রাত্রেই স্বপ্নে তোমায় দেখে তোমায় দেখবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়েছে। গত রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি যে, 'ফার্ণ' সংগ্রহ করবার জন্যে জাহাজে চড়ে তোমার সঙ্গে ইকাও গেছি,—সেখানে কে যেন

আমাদের মধ্যে এল,—তুমি যেন দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছ, ঠিক এমনি সময়ে আমি জলে পড়ে গেলুম। আমি চীৎকার করে ওঠাতে মা আমায় জাগিয়ে দিলেন। যখন বুঝলুম সেটা স্বপ্ন, তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু তবুও কে যেন আমায় যাতনা দিচ্ছে। তুমি শীগ্‌গির ফিরে এস, তোমার জন্যে আমি কত ভাবচি! নিজের মুখে তোমায় সব কথা বল্‌ব মনে করে তুমি যে-দিক থেকে আসছ প্রতিদিন সেই পূর্ব্বাকাশের দিকে দেখি। হয়ত রাস্তায় চিঠিখানা তোমায় অতিক্রম করে যাবে কিন্তু আমি এখানা হনোলুলুতে পাঠাচ্ছি।

তোমার স্নেহের পত্নী

নামি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহজীবন

কাওয়াশিমা-গৃহিণী আগুনের ধারে বসিয়া ছিলেন। সেইমাত্র ঘড়িতে আটটা বাজিল। মুখ তুলিয়া ঘড়ি দেখিয়া তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "আটটা বাজলো! তাদের ফেরা উচিত ছিল!" হৃষ্টপুষ্ট হাতখানি বাড়াইয়া তিনি তামাকের বাক্সটি গ্রহণ করিলেন। ধূমপানের নলে খুব জোরে কয়েকটা টান দিয়া স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

সহরের উপকণ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইলেও রাস্তা হইতে কুরুমা যাতায়াতের শব্দ আসিতেছিল। নববর্ষের পর কয়েক দিন ধরিয়া সন্ধ্যায় এইরূপই হইয়া থাকে। নিকটের একটি বাড়ী হইতে ক্রীড়ামত্ত বালকবালিকাদের আনন্দ-কোলাহল বৃদ্ধার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল, মাঝে মাঝে নিশার নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া হাসির তরঙ্গ উঠিতেছিল।

অসহিষ্ণুভাবে তিনি একবার গজ গজ করিয়া বলিলেন, "এত হাসি কেন? হ্যাঃ!" তারপর তাকেওর কথা মনে পড়িয়া গেল,

"যখনি আকাসাকা যায় তখনি এই রকম—সকলেই সব কাজ ভুলে যায়, তাকে, নামি সকলে! আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আর পারবার জো নেই!" বিড় বিড় করিতে করিতে তিনি যেই একটু নড়িতে গেলেন, অমনি একটা বেতো জায়গায় আঘাত লাগাতে "উঃ" করিয়া উঠিলেন। মুখবিকৃতি করিয়া রাগতভাবে তামাকের নলটা ঠুকিতে ঠুকিতে উচ্চকণ্ঠে তিনি ঝিকে ডাকিলেন, "মাৎসু, মাৎসু, অ মাৎসু!" ঠিক সেই সময়ে ফটকে দুইখানি কুরুমা আসিয়া দাঁড়াইল; ভৃত্য হাঁকিল, "প্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।"

নববর্ষের সৌখীন পোশাক পরিয়া পরিচারিকা ত্রস্তভাবে বেগে ঘরে প্রবেশ করিল। কর্ত্রীঠাকুরাণী কেন ডাকিয়াছেন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ধমক দিয়া উঠিলেন, "এত দেরী কেন?" পরিচারিকা থতমত খাইয়া প্রস্থান করিল।

এমন সময় তাকেও আসিয়া মাতাকে শুভসন্ধ্যা জ্ঞাপন করিল। নিজের ও স্বামীর জামা পরিচারিকার হাতে দিয়া তাকেওর ঠিক পশ্চাতে নামি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে মাতাকে শুভসন্ধ্যা জানাইয়া বলিল, "বড় দেরী হয়ে গেল।"

"যাক, তোমরা ফিরেছ তাহলে! গিয়েছিলে ত আজকে নয়!"

তাকেও কহিল, "হ্যাঁ মা! আমাদের খুব দেরীই হয়ে গেছে। আমরা প্রথমে গেলুম কাতোদের ওখানে। তাঁরা বল্লেন, আমাদের সঙ্গে আকাসাকা যাবেন। মেসোমশাই, মাসীমা, চিজুকোসান, নামি আর আমি পাঁচ জনে মিলে আকাসাকা গেলুম। আকাসাকার ওঁরা আমাদের দেখে ভারি খুসী। সেখানে আরো অনেকে এসেছিলেন, গল্প করতে করতে দেরী হয়ে গেল।" পরিচারিকার হাত হইতে এক পেয়ালা চা লইয়া পান করিয়া তাকেও আপনার মনে বলিল, "একটু যেন নেশা হয়েছে!" বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "আকাসাকার সকলে ভাল ত, নামি?"

"হ্যাঁ, তাঁরা সবাই ভালো আছেন। আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন। তাঁরা আসতে পারলেন না, আপনি যেন কিছু মনে না করেন এই কথা বলতে বলেছেন। আপনার সুন্দর উপহারের জন্যে আপনাকে বিশেষ-করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ উপহারের কথায় মনে পড়ে গেল, নামি, কোথায় গেল ওঁদের—এই যে!" এই কথা বলিয়া তাকেও নামির হাত হইতে একখানি রেকাবি লইয়া মাতার সামনে রাখিল। কতকগুলি শিকার-করা পাখী রেকাবির উপর সাজানো ছিল।

"পাখী দেখছি যে? এতগুলো—"

"হ্যাঁ মা, শ্বশুরমশাই এবারে খুব শিকার করেছেন, তিনি সবে একত্রিশে তারিখে ফিরেচেন। পাখীগুলো আজই আমাদের এখানে পাঠাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কাল একটা বুনো শূয়োর শিকার করেচেন।"

"বুনো শূয়োর? সত্যি না কি? নামি, তোমার বাবা ত আমার চেয়ে কেবল তিন বছরের ছোট, না? ছেলেবেলা থেকেই খুব সাহস তাঁর, এখনো দেখচি কম নয়!"

"তবে শোন মা, তাঁর এত শক্তি যে, তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে তিন রাত্তির কাটিয়েছেন, কিন্তু শরীর তাঁর একটুও খারাপ হয়নি। ছেলেছোকরার মত কষ্ট সইতে পারেন বলে তিনি গুমর করেন।"

"তা তো করবারই কথা বাপু! আমাদের মত যারা বাতে পঙ্গু তারা আর কোন্ কাজে লাগে বল। ব্যামোর মত আর মানুষের শত্রুর নেই। যাও তোমরা কাপড় ছেড়ে শোওগে। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে, আজ য়্যামুহিকো এসেছিল।"

তাকেও উঠিতে যাইতেছিল, কথাটা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইল বলিয়া বোধ হইল না। নামিও সচকিত হইয়া উঠিল।

"চিজিওয়া ?"

"সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।"

ক্ষণকাল থামিয়া তাকেও কহিল, "তাই না কি ? আমিও তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে টাকা চাইতে এসেছিল না কি মা ?"

"কেন ? না, না, এ রকম ভাবছ কেন তুমি ?"

"আমি তার বিষয়ে কিছু শুনেছি। থাক্, শীগ্‌গিরই তার সঙ্গে দেখা করব।"

"আর য়্যামাকিও এসেছিল।"

"অ! সেই মুখ্যুটা না কি ?"

"দগুই তোমাকে খাবার জন্যে বলে গেছে।"

"জ্বালালে !"

"তোমার যাওয়া উচিত। সে এখনো তোমার বাবার দয়া ভুলতে পারেনি।"

"কিন্তু——"

"না, তোমার নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত। আমি শুতে চল্লুম।"

তাকেও ও নামি উভয়ে তাঁহাকে শুভ-রাত্রি জ্ঞাপন করিয়া বিদায় হইল।

ঘরে আসিয়া নামি স্বামীর কোটটি খুলিয়া লইয়া একটি তুলা-ভরা রেশমী পোশাক তাহাকে পরাইয়া দিল। তাকেও একটি সাদা ক্রেপের কোমরবন্ধ বাঁধিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল। নামি তাহার কোটটি ঝাড়িয়া পাশের ঘরে টাঙাইয়া রাখিল, পরিচারিকাকে চা করিতে বলিয়া স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

"তোমার আজ বড় কষ্ট হয়েছে, না ?"

তাকেও চুরুট টানিতে টানিতে নববর্ষের চিঠি, কার্ড প্রভৃতি দেখিতেছিল, এই কথা শুনিয়া মুখ তুলিল। "আমার কেন, তোমার কষ্ট হয়েছে নামি-সান। আহা, কী সুন্দর !"

"কি ?"

"এই তোমাকে কী সুন্দর দেখতে !"

"আর ঠাট্টায় কাজ নেই !"

স্বামীর মুখে স্বীয় সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া সে লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল এবং চোখ দুটি ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোক হইতে ফিরাইয়া লইল। তাহার ম্লান কপোল গোলাপী আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, মাথায় গোল খোঁপা কাঁচের মত চক্‌চক্ করিতেছে। তাহার পরণে একটি কালো রঙের রেশমী 'কিমোনো', পা দুটি বেড়িয়া কিমোনোর যে অংশটি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে তার উপর ঢেউ আর সমুদ্রচর পাখীর ছবি আঁকা। কোমরে দুধের সরের রঙের একটি প্রশস্ত কোমরবন্ধ, বুকে একটি মণিবসানো পিন ; তাকেও সেটি আমেরিকা হইতে আনিয়াছিল। আলোকের সম্মুখে লজ্জাজড়িত স্মিতহাস্যে দণ্ডায়মানা পত্নীকে দেখিয়া তাকেও মুগ্ধ হইয়া গেল।

"তোমাকে ঐ পোশাকে দেখে মনে হচ্চে যেন আমার একটি নূতন স্ত্রী লাভ হয়েচে !"

"ও-সব কথা বল ত চলে যাব।"

তাকেও হাসিয়া বলিল, "আর বলবো না। কিন্তু চলে যাবে কেন ?"

এইবার নামিও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "কাপড় ছাড়তে যাব গো, কাপড় ছাড়তে যাব।"

গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই তাকেও সমুদ্রযাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছিল। শরতেই তাহার ফিরিবার কথা ছিল, কিন্তু জাহাজের কলকব্জা খারাপ হইয়া যাওয়াতে, সেগুলি মেরামতের জন্য স্যনফ্রান্‌সিস্‌কোতে অনেক দিন বিলম্ব হইয়া গেল। বছরের শেষাশেষি তাকেও বাড়ী ফিরিল। আজ, জানুয়ারি মাসের তেসরা সে প্রথম নামিকে সঙ্গে লইয়া কাজো

ও কাতাওকাদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আর ঘটিয়া উঠে নাই।

তাকেওর মাতা সেকেলে-ধরণের স্ত্রীলোক, তিনি বিদেশী ধরণ-ধারণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার পুত্র একালের ছেলে, তাহার রুচি একটু ভিন্ন রকমের হওয়া স্বাভাবিক; তাই তাহার সম্বন্ধে তিনি বেশী কড়াকড়ি করিতে পারিতেন না।

পুত্রের প্রশস্ত বৈঠকখানাটি দেশী ও বিদেশী উভয় ধরণেই সজ্জিত। ঘরের মেঝের উপর কোমল মাদুর বিছানো, তাহার উপর একখানি সবুজ কার্পেট পাতা। একটি দেয়ালে একখানি দৃশ্যচিত্র। তাহার সামনের দেয়ালে তাকেওর পিতা মিচিতাকের একখানি ছবি বিলম্বিত। ঘরের এক কোণে একটি পুস্তকের আলমারি ও কয়েকটি শেল্‌ফ্‌। সেখানে পিতার প্রিয় একখানি তরবারি। একটা শেল্‌ফের উপর নাবিকের একটা টুপি ও একটি দূরবীণ। একটা থামের গায়ে একখানা ছোরা ঝুলিতেছে। দেয়ালের গায়ে আরো কয়েকখানা ছবি; তন্মধ্যে, সে যে-যুদ্ধ-জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল তাহার ও শিক্ষানবীশ একদল নাবিকের ছবি ছিল। নাবিকদলের ছবিখানি, সে যখন য়েদাজিমার ইস্কুলে পড়িত, বোধ হয় তখনকার। টেবিলের উপরেও কয়েকখানি ছবি; একখানিতে তিনটি চেহারা—তাকেওর পিতামাতা ও তাকেও নিজে—তাকেওর যখন প্রায় পাঁচ বৎসর বয়স তখনকার, সে পিতার হাঁটুর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর একখানি সেনাপতির পরিচ্ছদে তাহার শ্বশুর কাতাওকার ছবি। ঘরের মালিকটি অল্পবয়স্ক ও অসাবধান হইলেও ঘরটি শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত, কোথাও কণামাত্র ধূলা নাই। টেবিলের উপর পুরাণো একটি ধাতুনির্ম্মিত ফুলদানিতে কয়েকটি 'প্লাম'গুচ্ছ সুচারুরূপে রক্ষিত। সমস্তই একটি স্নেহ-কোমল হৃদয় এবং

এই ঘরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কার্য্যে ব্যাপৃত তুইখানি সুন্দর হস্তের পরিচয় দিতেছিল। সেই হৃদয় ও হাতের মালিক ফুলদানির নিকটে একখানি রূপার ফ্রেমের মধ্য হইতে হাসিতেছে, যেন সে প্লামের মধুর সুরভিতে পরিস্নাত! ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো ঘরের চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল; সবুজ কার্পেটের উপর আগুনের বাক্স, তাহা হইতে কয়লার আগুনের বেগুনে শিখা উঠিয়া বেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস দিতেছিল।

অনেক জিনিসই মানুষকে আনন্দ দেয়। কিন্তু শীতের দেশে দীর্ঘ ভ্রমণের পর নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া, ভ্রমণের পোশাক ছাড়িয়া একটি ঢিলেঢালা পোশাক পরিয়া লোকে আগুনের ধারে যখন বসে, এবং বসিয়া বসিয়া বাহিরের নিশীথ বাতাসের করুণ ক্রন্দন ও ভিতরে সদাজাগ্রত ঘড়িটির টিক্ টিক্ শব্দ শুনে, তখন যেমন আনন্দ পাওয়া যায় এমন আর কথনো নয়। এই আনন্দ আবার শতগুণ বাড়িয়া উঠে, যদি গৃহে নীরোগ মাতা ও সুন্দরী তরুণী ভার্য্যা থাকেন।

আরাম-কেদারায় বসিয়া ধূমপানরত তাকেও ঠিক এমনি-ধারা আনন্দ উপভোগ করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মাতা যার কথা বলিতেছিলেন, কেবল সেই চিজিওয়ার চিন্তাই তাহাকে পীড়া দিতেছিল। এইমাত্র আগন্তুকদের কার্ডের মধ্যে সে তাহার নাম দেখিতে পাইয়াছে। আজই সে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ লজ্জার কথা শুনিতে পাইয়াছে। গত মাসে সমর-বিভাগের সদরে চিজিওয়ার নামে একখানা পোষ্টকার্ড আসে। ভ্রমক্রমে একজন কর্ম্মচারী কার্ডখানি উঠাইয়া লইয়া পড়ে। কার্ডখানা কোনো নামজাদা সুদখোরের নিকট হইতে আসিয়াছিল। তাহাতে লাল কালিতে চিজিওয়ার দেনার পরিমাণ লেখা ছিল। তারপর মাঝে মাঝে কোন অজ্ঞাত দ্বার দিয়া সামরিক গুপ্ততত্ত্বসকল বাহির হইয়া

পড়িতেছিল, তাহাতে কয়েকজন ব্যবসায়ীর বেশ ধনবৃদ্ধি হইতেছিল। চিজিওয়াকে না কি ষ্টকের বাজারেও ঘুরিতে দেখা গিয়াছে। সেস্থানে সামরিক কর্ম্মচারীর গতিবিধি কোন ক্রমেই মার্জ্জনীয় নয়। এই সব নানা কারণে চিজিওয়ার উপরই সকলের সন্দেহ হইয়াছে। শ্বশুর মহাশয়ের নিকট তাকেও সব শুনিয়াছে, তিনি সদরের প্রধান কর্ম্মচারীর বিশেষ বন্ধু। তিনি তাকেওকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, চিজিওয়াকে তাহার স্বভাব সংশোধন করিবার জন্য যেন সে বলে।

"পাজি কোথাকার!" নিজের মনে এই কথা বলিয়া তাকেও পুনরায় চিজিওয়ার কার্ড দেখিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে এই সব অপ্রীতিকর চিন্তা করিতে পারিল না। সে নিজে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহা করিবার তা করিবে। তাহার মন পুনরায় বর্ত্তমান স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। এমন সময় নামি পোশাক পরিবর্ত্তন করিয়া চায়ের পেয়ালা হস্তে উপস্থিত হইল।

"চা? ধন্যবাদ।"

চেয়ার ছাড়িয়া তাকেও আগুনের ধারে গিয়া বসিল।

"মা কি করচেন?"

"তিনি এই শুতে গেলেন।"

নামি স্বামীর হাতে এক পেয়ালা চা দিল। তাহার রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার কি মাথা ধরেচে? অতটা 'সাকে' না খেলেই হত! মা পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন!"

"না, না। আজ ভারি আমোদ করা গেছে। বাবার কথা শুনে আমার এমন ভালো লাগছিল যে কতটা 'সাকে' খেলুম কিছুই হুঁস ছিল না।" তাকেও হাসিয়া উঠিল। "বাস্তবিক নামি তোমার বাবা বড় ভাল!" নামি ঈষৎ হাসিল, স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আর তার চেয়েও ভালো আমার—"

"কী! কি বল্‌লে?"

বিস্ময়ের ভান করিয়া তাকেও চক্ষু ঘুরাইতে লাগিল।

"ও বাবা! এসব কথা তুমি শিখলে কবে? এসব কথার দাম যে অনেক বেশী, একটা পিনে ত কুলুবে না!"

আগুনে তাতানো হাত দুখানি লাজরক্তিম কপোলে ঘষিয়া একটি ছোটখাটো নিশ্বাস ফেলিয়া নামি চিন্তাজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "সত্যি, মা নিশ্চয়ই অনেক দিন বড় একলা বোধ করেছেন। যখন ভাবি আবার তুমি শাগ্‌গির কাজে বেরিয়ে যাবে তখন মনে হয় সময়টা যেন ছুটে চলেছে।"

"আবার আমি যদি সব সময় বাড়ী থাকতে আরম্ভ করি তুমি নিশ্চয়ই এক-দিন-অন্তর বলবে, যাও, যাও একটু বেড়িয়ে এস।"

"কি যে বল! আর চা দেবো?"

পেয়ালায় এক চুমুক দিয়া এবং চুরুটের ছাই আগুনের বাক্সে ফেলিয়া তাকেও পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত ঘরের চারিদিকে চাহিল।

"ছ' মাসের বেশী জাহাজে সরু বেঞ্চের ওপর দোলা খেয়ে এখন এ ঘরটাকে বড্ড বড় বলে বোধ হচ্ছে। এখানে যেন সবই স্বর্গের মত আরাম দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার মধুবাসর উপভোগ করছি! তোমার কি তা মনে হয় না নামি?"

বিবাহের পরই তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল আজ প্রায় ছয় মাসের পর মিলন, এমন সুখের সময় আর কখনো আসিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। মুখে কথা নাই, অধরে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে, উভয়ে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া তাহারা যেন কোন্ স্বপ্নের আবেশে বিভোর! প্লামের গন্ধে ঘরটি আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে, তরুণ দম্পতী আগুনের ধারে বসিয়া বসিয়া কোন্ সুখের স্বর্গে উধাও হইয়া গিয়াছিল। নামি মাথা তুলিল, হঠাৎ যেন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

"তুমি তা হলে য়্যামাকির ওখানে যাচ্ছ।"

"য়্যামাকির ওখানে? মা বলেছেন যেতে। যেতেই হবে বোধ হয়।"

"আমিও যাব।"

"নিশ্চয়ই! আমরা এক সঙ্গে যাব।"

"না, আমি যাব না।"

"কেন যাবে না?"

"আমার ভয় করে।"

"ভয়? কিসের ভয়?"

"আমায় দেখতে পারে না জান ত।"

"দেখতে পারে না? কে দেখতে পারে না?"

"একজন আমায় দেখতে পারে না। বলবো? ওতোয়ো-সান।"

"পাগল! সে একটা অদ্ভুত মেয়ে, না? তাকে কে বিয়ে করবে তাই ভাবি।"

"মা বলছিলেন য়্যামাকির সঙ্গে চিজিওয়ার খুব আলাপ। সে ত বিয়ে করতে পারে।"

"চিজিওয়া? চোর সে! আমি ভাবতুম সে বেশ বুদ্ধিমান, চালাকচতুর লোক। একবারও ভাবিনি তার ওপর কখনো সন্দেহ আসতে পারে। আজ-কালকার কর্ম্মচারীদের কথা ভাবলে লজ্জা হয়, যদিও আমি তাদেরই একজন। সামুরাইদের তেজের এক কড়া তাদের নেই। তারা চায় কেবল বড় লোক হতে।

"আমি অবশ্য এ কথা বলছি না যে, কর্ম্মচারীরা গরীব হয়ে থাকুক। তারা টাকা জমাক, তাদের পরিবারের যাতে কষ্ট না হয় —এতে আমার কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এই কথা বলতে চাই, যার ওপর দেশরক্ষার ভার রয়েছে, তার কেবল টাকা রোজকার উদ্দেশ্য করাই অন্যায়। বিশেষত বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে, বা

গরীব সৈনিকের খাবার চুরি ক'রে, কিংবা জোগানদারদের সঙ্গে জোট ক'রে বে-আইনি রকমে টাকা রোজকার। সব চেয়ে আমার রাগ হয় জুয়ো-খেলায়। আমি জানি আমাদের কোনো কোনো কর্ম্মচারী এই কাজ করে। এ আমার একেবারে বরদাস্ত হয় না। আজকাল সবাই যেন ওপরওলার খোসামুদি ও তাঁবেদারের টাকা লুট করতে ব্যস্ত।"

সংসারানভিজ্ঞ তরুণ কর্ম্মচারী অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ক্রটিগুলো ভীষণভাবে আক্রমণ করিতেছিল, যেন তাহাদের মুখের সামনে বলিয়া যাইতেছে! তাহার প্রত্যেক কথা নামি পুলকমুগ্ধ হৃদয়ে পান করিতেছিল। এমন স্বামী তাহার! তিনি নৌ-বিভাগের মন্ত্রী হইয়া সমস্ত ক্রটি ও দোষের সংস্কার করেন না কেন!

"তুমি যা বল্‌ছ, তা আমারও খুব সত্যি বলে মনে হয়। আমি অবশ্য এসব বিষয়ে বেশী কিছু জানি না, কিন্তু বাবা যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন কত লোক কত উপহার নিয়ে আস্‌ত, তারা কত রকম যে আর্জ্জি কর্‌ত তা আর কি বল্‌ব। বাবা তাদের রকম সকম ভালবাসতেন না, বলতেন, যা করবার তা তিনি করবেন, তা তারা আর্জ্জি করুক আর নাই করুক; আর যা করবার নয় তা তিনি করবেন না তারা উপহারই দিক আর নাই দিক। কিন্তু তবু তারা কোনো-না-কোনো ছল করে উপহার পাঠাতো। বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, সবাই যে কর্ম্মচারী হতে চায় তাতে আর আশ্চর্য্য কি!"

"ঠিক তাই। এ বিষয়ে নৌ-বিভাগও যেমন সেনা-বিভাগও তেমনি। টাকাই সব!"

ঘড়িটা বাজিতে আরম্ভ করিল। তাকেও ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "দশটা বাজলো যে!"

নামি কহিল, "সত্যি, সময়টা কি করে গেল বল দেখি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

য়্যামাকির ভোজ

সিবায় হ্যোজো য়্যামাকির যে ভূসম্পত্তি, তা খুব বেশী না হইলেও উহা নিশিনোকুবো পাহাড়ের কতকটা অংশ অধিকার করিয়া ছিল। সাকুরাগাওয়ার রাস্তার খানিকটা অংশ উহার এক ধারের সীমানা। বাগানে একটা পুষ্করিণী। অনেকগুলি স্বাভাবিক পাহাড় স্থানটিকে বন্যশ্রী প্রদান করিয়াছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে সরু পথ। পুষ্করিণীর যে অংশগুলি অপ্রশস্ত সেখানে ছোট ছোট পুল। মেপল্ চেরি, দেবদারু আর বাঁশের ঝাড় স্থানটির সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে। এ সবার মাঝে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ল্যাম্প-পোষ্ট ও একটি অদ্ভুত রকমের 'ইনারি'-মন্দির কেমন একটা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়াছে। রাস্তা হইতে অনেক দূরে একটি গ্রীষ্মবাটিকা যেন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া আগন্তুকের বিস্ময় বর্দ্ধনের জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একটা সাধারণ গোছের জমির মধ্যে এমন সুন্দর বাগান, আশ্চর্য্যের কথা বটে; উহা তৈয়ার করিতে য়্যামাকির অন্যায়লব্ধ অনেক সহস্র টাকা খরচ হইয়াছে।

বিকাল বেলা। চারিটা বাজিয়া গেছে। দূরে ও নিকটে কাকেরা কোলাহল করিতেছে। বাগানের মধ্যে একটি পাহাড় অস্তগামী সূর্য্যের আলোকে ঈষৎ উদ্ভাসিত। সেই পাহাড় বাহিয়া দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত একটি লোক উপরে উঠিতেছিল।

সে তাকেও। মাতার অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া য়্যামাকির ভোজে আসিয়াছে কিন্তু কতকগুলো অজানা লোকের সঙ্গে বসিয়া বিস্বাদ 'সাকে' পান করায় সে কোনো আনন্দ পায়

নাই। আমোদের আয়োজন ছিল নানা রকমের। সর্ব্বশেষে হইল পেশাদার নর্ত্তকীর নাচ ও সমবেত সকলের বিকট হল্লা। এই সব অসভ্যতা দেখিয়া তাকেও বহুপূর্ব্বেই ফিরিয়া যাইবে মনে করিয়াছিল কিন্তু য়্যামাকি বারবার শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। চিজিওয়ার সঙ্গে দেখা করাটাও নিতান্ত প্রয়োজন, সে তখনও আসে নাই। তাই সে কিছুক্ষণের জন্য বাহির হইয়া বেড়াইতেছে, তপ্ত ললাট সে সন্ধ্যার বাতাসে জুড়াইতে চায়।

শ্বশুর মহাশয়ের নিকট চিজিওয়ার কীর্ত্তিকাহিনী শুনিবার কয়েক দিন পরে কুমীরের চামড়ার একটি মনিব্যাগ হাতে লইয়া একটি অজানা লোক আসিয়া তাকেওকে একখানা হ্যাণ্ডনোট দেখাইয়া তিন হাজার টাকার দাবী করিল। নোটখানি তাকেও কখনও চক্ষে দেখে নাই। উহার উপর য়্যাসুহিকো চিজিওয়ার স্বহস্ত-লিখিত সহি। আর কী আশ্চর্য্য! নোটখানি দিয়াছে তাকেও! তাহার নামের মোহরের ছাপ পর্য্যন্ত রহিয়াছে! লোকটি বলিল নোটে লিখিত সময় অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কর্জ্জকারী ধার শোধ করিয়া উহা ফেরত লইবার কোনো চেষ্টাও করে নাই—হঠাৎ কোথায় উঠিয়া গিয়াছে তাহার দেখা নাই। সেই জন্য সে টাকা দাবি করিতে আসিয়াছে। চিজিওয়ার আপিসেও তাহার দেখা পায় নাই। নোট খানি বোধ হইল আইনতঃ নির্ভুল, নিঃসন্দেহ চিজিওয়ার লেখা। এই ঘটনায় আশ্চর্য্য হইয়া তাকেও তৎক্ষণাৎ খোঁজখবর আরম্ভ করিল। মাতা ও ভাণ্ডারী তাজাকি উভয়েই বলিলেন, তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না; তাকেওর নামের মোহরও তাঁহারা কখনো চিজিওয়াকে ব্যবহার করিতে দেন নাই। চিজিওয়া সম্বন্ধে সম্প্রতি যে-সব গুজব রটিয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিয়া, ব্যাপারটা যে কি, তা বুঝিতে তাকেওর বিলম্ব হইল না। সেই দিনই সে

চিজিওয়ার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু চিজিওয়ার পত্র আসিল—পর দিন য়্যামাকির বাড়ীতে দেখা করিতে লিখিয়াছে।

তাহার সহিত সাক্ষাৎমাত্র ব্যাপারটা কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে, স্পষ্ট কথায় চট্‌পট্ তাহার সম্বন্ধে নিজের অভিমতটা শুনাইয়া দিয়া ব্যস্! চলিয়া যাইবে—ইহাই তাকেও স্থির করিয়াছিল। কিন্তু চিজিওয়ার দেখা নাই। রাগে গস গস করিতে করিতে সরু বাঁশের ঝোপের ধার দিয়া পাহাড়ের পথ বাহিয়া তাকেও উঠিতে লাগিল। আইভি-লতায়-ঘেরা গ্রীষ্মবাটিকায় কিছুক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিয়াছে, এমন সময় সে নিকটস্থ পথে কাষ্ঠপাদুকার মৃদু শব্দ শুনিতে পাইল। হঠাৎ তাহার সামনে তোয়ো আসিয়া হাজির। মাথায় উঁচু 'শিমাদা'-খোঁপা, পরণে তিন থাক ক্রেপের বসন। তাহার জমকালো পোশাক ও কদাকার চেহারার মধ্যে কী অসামঞ্জস্য! কাস্তের মত সরু চোখ আরো সরু করিয়া সে কহিল, "তুমি তা হ'লে এখানে!"

কামানের প্রচণ্ড গোলার মুখেও যে কখনও ভয় পায় নাই, সেই তাকেও এই অপ্রত্যাশিত শত্রুর আক্রমণে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। পিছন ফিরিয়া চম্পট্ দিবার উপক্রম করিল। ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া মেয়েটি 'তাকেও-সান' 'তাকেও-সান' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল

"কেন?"

"বাবা তোমায় বাগানটা দেখাবার জন্যে আমাকে বল্‌লেন।"

"তোমাকে দেখাতে বল্লেন? আমাকে দেখাবার কিছু দরকার নেই।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু টিন্তু নয়। আমার যেখানে খুসি সেখানে যাব। বিরক্ত

কোরো না।” আর কেহ হইলে এরূপ কঠিন প্রত্যাখ্যানে দমিয়া যাইত। কিন্তু তোয়ো দমিবার পাত্র নয়।

“আমার কাছ থেকে পালাতে চাচ্ছ কেন বলতে পার?”

তাকেও থামিল।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তাকেওর পিতা একটি জেলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তোয়োর পিতা তাঁহার অধীনে কার্য্য করিত। সেই সময় তাকেওর সহিত তোয়োর প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। তখন তাকেও বালক মাত্র। মেয়েটিকে সে জ্বালাতন করিত, কখনো কখনো কাঁদাইতেও ছাড়িত না; কিন্তু এ সব সত্বেও তাকেও তাহার স্নেহলাভে বঞ্চিত ছিল না। আজ কত বৎসর অতীত হইয়া গেছে, কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, শিশু যুবক হইয়া উঠিয়াছে। দুষ্ট বালক তাকেও এখন যুবক ব্যারন কাওয়াশিমা, তাহার পত্নী যুবতী। কিন্তু তোয়ো এখনো তাহাকে ভালবাসে! সাদাসিদে ধরণের হইলেও তাকেও তাহার মনের ভাব কিছু কিছু বুঝিত, তাই কালেভদ্রে যখনই য়্যামাকির নিকট আসিত, তখনই খুব সাবধানে থাকিত। আজ অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

“পালাবো? পালাবো কেন? আমার ইচ্ছামত আমি ঘুরে বেড়াই।”

“তুমি নিষ্ঠুরের মত কথা কইচ!”

তাকেওর বিরক্তি বোধ হইতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল ফিরিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু কেমনধারা বোকা বনিয়া গিয়া ‘ন যযৌ ন তস্থৌ’ অবস্থায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। বাগানের এই নির্জ্জন অংশে মেয়েটির হাত হইতে আর নিস্তার নাই! অবশেষে তাকেওর মাথায় একটা মতলব আসিল।

“চিজিওয়া এসেছে না কি? ওতোয়ো-সান, লক্ষীটি গিয়ে দেখনা এক বার।”

"সন্ধ্যের আগে চিজিওয়া আসবে না।"

"সে এখানে সর্ব্বদা আসে না কি ?"

"আসে বই কি। কাল অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত বাবার সঙ্গে কথা কইছিল।"

"বটে ? কিন্তু এতক্ষণ সে এসেছে বোধ হয়। লক্ষ্মীটি এক বার দেখ না।"

"না, আমি যাব না।"

"কেন ?"

"তুমি তাহলে নিশ্চয় পালাবে। তুমি আমায় ভালো না বাসতে পার, নামিকো-সানকে খুব সুন্দর ভাবতে পার, কিন্তু আমায় এমনি করে তাড়িয়ে দেওয়াটা কি ভাল ?"

তাহার সহিত তর্ক করিবার প্রবৃত্তি হইল না, তাকেও চলিতে লাগিল। এমন সময় শুনিতে পাইল কে যেন তোয়োকে ডাকিতেছে। পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে কি বলিতে লাগিল। অবসর পাইয়া তাকেও বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে একেবারে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এখানে আর আক্রমণের ভয় নাই !

সূর্য্য ডুবিয়াছে। অভ্যাগতেরা বিদায় হইয়াছে। দিবসের কোলাহলটা এখন রন্ধনশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। উপরকার জোব্বাজাব্বা পোশাক খুলিয়া গৃহস্বামী য্যামাকি টলিতে টলিতে বাড়ীর পিছনের একটা ছোট ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একখানা চুরটের রেকাবি। ঘরে ঢুকিয়াই সে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে তাহার রক্তবর্ণ কপাল চক্ চক্ করিতেছিল।

"মাপ করবেন, আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। যাহ'ক আজ খুব আনন্দ করা গেছে !" সে হাসিল। "ব্যারন আপনি

নাবিক হয়ে ‘টানতে’ পারেন কৈ? আপনার বাবা বোতলের পর বোতল ওড়াতেন। বুড়ো হলেও আমি হোজো য়্যামাকি—আধ গ্যালন খানেক পার করতে সহজেই পারি।”

চিজিওয়া য়্যামাকির দিকে তার গাঢ়-কৃষ্ণ চক্ষু ফিরাইয়া কহিল, “ফূর্ত্তি যে আর ধরে না, য়্যামাকি সান! খুব পয়সা কর্‌চ বুঝি?”

“তা নয় ত কি! তা যদি বল্‌লে তবে”—অনেকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে সে পাইপটি ধরাইতে সমর্থ হইল। পাইপে একটা টান দিয়া বলিল, “সেইটে—কি বলচি বুঝ্‌চ বোধ হয়—এখন বাজারে। আমি ভেতর ভেতর খবর নিয়েচি। অবস্থা তাদের সঙ্গীন। সস্তায় খুব দাঁও মারতে পারি। কাজটায় খুব লাভ। আর বিদেশীরা যখন দেশের ভেতরে থাকবার অনুমতি পেয়েচে, তখন কথাই নেই, একেবারে পোয়া বারো! ব্যারন আপনি কেন বিশ কি ত্রিশ হাজার টাকা তাজাকি-কুনের নামে খাটান না, নিশ্চয় লাভ করবেন।”

মাতালের কথা স্রোতের মত হু হু করিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাকেও চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল, চিজিওয়া একবার তাহার দিকে আড় চোখে চাহিয়া বলিতে লাগিল, “ঐ আওমোনো ষ্ট্রীটের ওরা ত? ওদের একবার খুব ভালো কাজ হয়েছিল, না?”

“হ্যাঁ, কিন্তু চালাবার দোষে সব মাটি করে ফেল্লে। ঠিক করে চালানো যদি যায় তাহলে এটা একটা ‘সোনার খনি’ হয়ে দাঁড়াবে!”

“আহা, কী সুযোগটাই ছিল! কিন্তু আমার মত গরীবের ত আর কর্ম্ম নয়। তাকেও-কুন তোমার চেষ্টা করা উচিত।”

এ পর্য্যন্ত তাকেও একটিও কথা কহে নাই। অসন্তোষের কালো ছায়া তাহার ভ্রূর মধ্যে পভিত্ত হইয়া উহাদিগকে কুঞ্চিত করিয়া

আনিয়াছিল। তাহাদের উভয়ের উপর একটা সরোষ কটাক্ষপাত করিয়া তাকেওর বলিতে লাগিল, "তোমায় ধন্যবাদ। আমি যে-কাজে রয়েচি, তাতে কবে যে মাছের পেটে যাব বা গোলার ঘায়ে মরব, তার কিছু স্থিরতা নেই। আমাদের টাকা করবার কি দরকার তা ত বুঝি না। আমার যদি টাকা থাকৃত, আমি তা হলে ত্রিশ হাজার টাকা তোমাদের এই কাজে না খাটিয়ে নাবিকদের শিক্ষার জন্যে দিতুম!"

চিজিওয়া চট্ করিয়া তাকেওর মুখখানি দেখিয়া লইল ও য়্যামাকির দিকে ফিরিয়া চোখ টিপিল।

সে বলিল, "য়্যামাকি-সান তুমি আমাকে স্বার্থপর ভাবতে পার, কিন্তু তোমায় একটু সবুর করতে হবে, আগে আমার কাজটা হয়ে যাক। ব্যারন কাওয়াশিমা দয়া করে আমার অনুরোধ শুনেচেন, তোমায় যা করতে হবে বলেছিলুম তাই কর। তোমার নামের মোহরটা সঙ্গে আছে ত?"

প্রমিসারি নোটের মত কি একখানা বাহির করিয়া সে য়্যামাকির সামনে রাখিল।

চিজিওয়াকে যে লোকে সন্দেহ করিত, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। গত বৎসর সে য়্যামাকির পরামর্শদাতা ও গুপ্তচরের কাজ করিয়া তাহার লাভের অংশীদার হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সরকারী টাকা লইয়া ষ্টকের বাজারে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে গিয়া পাঁচ হাজার টাকার উপর লোকশান দিয়াছে। য়্যামাকির নিকট হইতে ও নিজের পকেট ঝাঁটাইয়া সে কষ্টেস্থষ্টে তুই হাজার টাকা জোগাড় করিল, কিন্তু এখনও তিন হাজার টাকা বাকি। তাহার একমাত্র ধনী কুটুম্ব কাওয়াশিমা। তাকেওর মাতা বা কাওয়াশিমা-গৃহিণীর সে বিশেষ প্রিয়পাত্র। কিন্তু বুড়ীর মুঠার ভিতর দিয়া জল গলে না, তাহার নিকট ধার চাওয়া যায়

কেমন করিয়া! টাকাটাও না হইলে নয়। তাই সে তাকেওর মোহর জাল করিয়া অতিরিক্ত সুদে কর্জ্জ করিয়াছে! ধার শোধ করিবার সময় শীঘ্রই উত্তীর্ণ হইল, এবং পাওনাদারটা এমন অসহিষ্ণু যে তাহার আপিসে গিয়া এক নোটিস জারি করিয়াছে! উপায়ান্তর না দেখিয়া সে সেইমাত্র গৃহপ্রত্যাগত তাকেওর নিকট তিন সহস্র টাকা কর্জ্জ লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাকেওর অর্থে তাকেওর মান রক্ষার চেষ্টা হইতেছিল! সেদিন সে তাকেওর বাড়ী গিয়া তাহার দেখা পায় নাই। তারপর সরকারি কাজে তাহাকে কয়েকদিনের জন্য সহরের বাহিরে যাইতে হয়, ইতিমধ্যে পাওনাদারটা যে কাওয়াশিমার বাড়ী গিয়াছিল সে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

য়্যামাকি ঘাড় নাড়িল! ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে লাল কালির প্যাড আনিতে বলিল। তারপর তাড়াতাড়ি একবার নোটের উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া শীল-মোহরটি বাহির করিল ও নিজ নামের নীচে জামিন স্বরূপ একটি ছাপ দিল।

চিজিওয়া নোটখানি উঠাইয়া লইয়া তাকেওর সামনে রাখিয়া কহিল,—"এই ত নোট তৈরি। টাকাটা কখন পাওয়া যাবে?"

"সঙ্গেই আছে।"

"তোমার সঙ্গে? ঠাট্টা করছ!"

"হ্যাঁ আমারই সঙ্গে। এই নাও—তিন হাজার টাকা।"

"ঠিক আছে ত?"

পকেটের মধ্য হইতে কাগজে-মোড়া কি-একটা বাহির করিয়া সে চিজিওয়ার দিকে ছুড়িয়া দিল।

সে উহা তুলিয়া লইয়া খুলিল—হঠাৎ তার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই ভয়ানক ক্রোধে তাহার দাঁত কড়মড় করিতে লাগিল। যে নোট সে ভাবিতেছিল এখনো সুদখোরটার হাতে, এ যে সেই নোট!

সবিশেষ অনুসন্ধানের পর তাকেও ইতিপূর্ব্বেই গোপনে দেনা চুকাইয়া দিয়াছে। "কেন, এটা ত—"

"চিনতে পারছ না যেন! মানুষের মত এই বার দোষ স্বীকার কর।"

যে-তাকেওকে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে বালক বলিয়া উপহাস করিয়া আসিয়াছে তাহার নিকট এই পরাজয়! ক্রোধে চিজিওয়ার গা জ্বলিতে লাগিল।

য়্যামাকি হতভম্বের মত বসিয়া লম্বা ধূমপানের নলটি উল্টা দিকে ধরিয়া উভয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল।

তাকেও কহিল—"চিজিওয়া, এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমাদের মধ্যে ভায়ের সম্বন্ধ, তাই মোহর জাল করার জন্যে কখনো নালিশ করব না। আমি তিন হাজার টাকা দিয়ে দিয়েচি। আর তোমার আপিসে তারা তাগাদা করতে যাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেক।"

অপ্রতিভের একশেষ হইয়াও, যেন বিচলিত হয় নাই এরূপ ভাব দেখাইবার জন্য চিজিওয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাকেওর উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিতে পারিলে তবে তাহার ক্ষোভ যাইত। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল, ব্যাপার এখন অনেক দূর গড়াইয়াছে। তাই চট্ করিয়া ভাব ফিরাইয়া ফেলিল।

"তোমার কথা শুনে ভাই আমার লজ্জা হচ্ছে। কি করব বল, বাধ্য হয়ে—"

"বাধ্য হয়ে? সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম ভেঙে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়েছিলে?"

"আরে আমার কথাটা আগে শোন। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জান, আমার টাকার ভারি দরকার পড়েছিল, কোথায় পাই তার ঠিক ছিল

না। তুমি বাড়ী থাকলে তোমাকে গিয়ে নয় বলতুম, মাসীমাকে ত আর বলতে পারি না। টাকাটা না পেলেই নয়, গত মাসে কিছু পাবার আশা ছিল তার ওপর নির্ভর করে আমি—কাজটা বড়ই অন্যায় হচ্ছে বুঝেছিলুম, কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেলে তোমার কাছে স্বীকার করব ঠিক করেছিলুম।"

"ও সব বাজে কথা। দোষ স্বীকার করবার যার ইচ্ছে ছিল, সে কি কখনও আরো তিন হাজার টাকা বিনা বাক্যব্যয়ে ধার করতে চায়!"

তাকেওর ক্রোধ দেখিয়া য়্যামাকি চিন্তিত হইয়া পড়িল, যদি সে চিজিওয়াকে আক্রমণ করে! তাই বলিল, "ব্যারন থামো। রেগো না। আমি এ বিষয় কিছুই জানিনা, কিন্তু উনি তোমার ভাই, তোমার একটু নরম হওয়া দরকার। হাজার দু তিন টাকা আর এমন বেশী কি? চিজিওয়ার দোষ হয়েচে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কথাটা যদি জানাজানি হয় ত ওর চাকরি যাবে। তাই ব্যারন মিনতি কর্‌চি—"

"আমি ত বল্লুম সেই জন্যেই আমি ধার শোধ করেচি, নালিশও করব না। তুমি চুপ কর য়্যামাকি, তোমার ত আর কিছু হয় নি।" চিজিওয়ার দিকে ফিরিয়া সে কহিল, "না, তা আমি করব না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা এই মুহূর্ত্ত থেকে ভেঙে দিতে চাই।"

ব্যাপারটা যখন এতদূর গড়াইয়াছে তখন আর ভয় করিবার প্রয়োজন নাই! চিজিওয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিতে লাগিল, "ভেঙে দেবে? আমার তাতে বিশেষ দুঃখ নেই, কিন্তু—"

তাকেওর চক্ষু হইতে যেন আগুন বাহির হইতেছিল। "হ্যাঁ, এখন টাকা পেয়েছ, এখন আর বন্ধুত্বে দরকার কি? চোর কোথাকার!"

য়্যামাকি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, সে বলিতে লাগিল, "ব্যারন

—চিজিওয়া-সান—শোন—একটু, একটু স্থির হও। ও রকম করে ত মীমাংসা হবে না। বলি শোন—বুঝচ।" এধার ওধার চাহিয়া সে বলিতে লাগিল, "শোন শোন!"

তাহারা স্থির হইল। কিছুক্ষণ পরে চিজিওয়ার দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাকেও কহিতে লাগিল, "চিজিওয়া, আর আমার বলবার কিছু নেই। ছেলেবেলা থেকে আমরা সহোদরের মত বেড়ে উঠেচি। বাস্তবিক বলতে কি বয়স ও বুদ্ধিতে তুমি আমার চেয়ে বড় এই রকমই ভেবে এসেছি। ভেবেছিলুম দুজনে দুজনকে সাহায্য করব। যতদিন সম্ভব আমার যথাসাধ্য তোমার জন্যে করব স্থির করেছিলুম। এই সে দিন পর্য্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে কোন কথা আমি শুনতে চাই নি। কিন্তু তুমি আমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়েচ। আমাকে ঠকানো, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু তার চেয়েও বেশী তুমি—যাক্ বল্‌ব না। তিন হাজার টাকা কি করে খরচ করলে সে কথা আমি শুনতে চাই না। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই। লোকের চোখ কান কত তীক্ষ্ণ তুমি হয় ত জান না, কিন্তু আমার কথা শোন তোমায় এখন সন্দেহ করচে অনেকে। সাবধান হও, যেন সৈনিকের সম্মান হারিয়ো না। তোমার কাছে দেখচি অর্থের বাড়া আর কিছু নেই। বেশী বলায় কোন লাভ দেখি না, কিন্তু লজ্জাটা কি তা একবার ভেবে দেখ। ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে কখনো দেখা করব না। এইবার তোমায় দস্তুরমাফিক তিন হাজার টাকা দিই।"

গম্ভীরভাবে এইরূপ কহিয়া তাকেও সম্মুখস্থিত নোটখানি তুলিয়া লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বেগে পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিল। য়্যামাকির কন্যা তোয়ো সেখানে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। তাকেওর সহিত ধাক্কা লাগাতে সে

পড়িয়া গেল। তাহার ক্রন্দনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাকেও ফটকের দিকে চলিয়া গেল।

চিজিওয়া সেইমাত্র য্যামাকির দিকে চোখ তুলিয়াছে। হতভম্ব য্যামাকি তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কী ছেলেমানুষ! কিন্তু চিজিওয়া-সান, আত্মীয়তা ভাঙার বদলে তিন হাজার টাকা; নেহাৎ মন্দ নয়, কি বল?"

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নোটের টুকরার উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া চিজিওয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনের কথা

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে নামির ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। শীঘ্রই সে আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু একদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত শাশুড়ীর পোশাক সেলাই করিয়া আবার সে পীড়িত হইয়া পড়িল। আজ মাসের পনেরই, আজও সে শয্যাশায়িনী।

প্রতি বৎসরই শীতের সময় লোকে বলে যে এবারকার মত শীত আর কখনো হয় নাই। কিন্তু সে বৎসর বাস্তবিকই তাহাদের মন্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রতিদিন কনকনে উত্তুরে বাতাস বহিতেছিল, তুষার ও বৃষ্টিপাত হইতেছিল—পরিষ্কার দিনেও শীতে হাড় পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। বলিষ্ঠ লোকেরা পীড়িত হইয়া পড়িল, দুর্ব্বলেরা মরিতে লাগিল—সংবাদপত্রে মৃত্যুর সংবাদ যথেষ্ট বাহির হইতেছিল। নামি বলিষ্ঠ ছিল না, শীতের জন্য সে

সারিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শরীরে বিশেষ কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও মাথা ভার, ক্ষুধার লেশ মাত্র নাই, এই অবস্থায় মন্থরভাবে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল।

ঘড়িতে সেইমাত্র দুইটা বাজিয়াছে। বাজনার শব্দ মিলাইয়া গেলে কিছুকালের জন্য সমস্তই নিস্তব্ধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঘড়ির মৃদু টিক্ টিক্ শব্দ নিস্তব্ধতা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিল। বড় সুন্দর দিন। নবীন বসন্তের আকাশের নীলিমা চারিখানি কাগজের পর্দার অন্তরালে ঢাকা পড়িলেও, সূর্য্যের মৃদু আলোক তাহাদের উপর উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়া ছিল। নামি শুইয়া শুইয়া একটি কালো মোজা বুনিতেছিল। তাহার চপল অঙ্গুলির চারিদিকে ও তুষার-শুভ্র বালিসের উপর অযত্নে ছড়ানো মসৃণ চুলের উপর কয়েকটা অদৃশ্য আলোকরশ্মি যেন নাচিয়া বেড়াইতেছিল। বাম দিকে পর্দ্দার উপর রঙীন পাতার ক্ষীণ ছায়া একটি পিতলের পাত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণে একটি স্থূলকাণ্ড পুরাতন প্লাম গাছের ছায়া সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, উহার নগ্ন শাখাগুলি কোলাকুলি করিয়া রহিয়াছে। তাহার উপর সামান্য দুই চারিটা ফুল, বসন্ত যে এখনো নিতান্ত অপরিণত, তাহাই জানাইতেছিল। একখানি পর্দ্দার উপরকার তক্তার উপর রৌদ্র-পোহাইতে-ব্যস্ত বিড়ালশিশুর ক্ষুদ্র মস্তকের ছায়া পড়িয়াছে। সূর্য্যের আলোকে আকৃষ্ট হইয়া একটি পতঙ্গ আসিয়াছিল, উহাকে ধরিবার জন্য বিড়ালটি লাফাইয়া উঠিল, ধরিতে না পারিয়া মেঝের উপর চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু তার যেন খেয়াল নাই এমনি ভাবে সে থাবাগুলি চাটিতে চাটিতে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। মস্তকের প্রতিবিম্বটি কেবলি নড়িতেছিল। নামি কাগজের উপরকার ছায়ার সমস্ত ঘটনাটি দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, তারপর, চোখ টাটাইয়া উঠিয়াছিল, তাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

স্থির হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া অর্দ্ধসমাপ্ত মোজাটা এক বার থাবড়াইয়া লইল। সূচগুলা আবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

বারান্দার উপর গুরু পদশব্দ শুনা গেল। একটি স্থূল খর্ব্বাকার মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া কাগজের পর্দ্দার গায়ে গায়ে চলিতেছিল। অবিলম্বেই ছায়াটি থামিল, অমনি কাওয়াশিমা-গৃহিণী প্রকাশিত হইলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বিছানার ধারে বসিলেন।

"আজ কেমন আছ?"

"অনেক ভালো মা, উঠতে পারি কিন্তু—"

কাজ রাখিয়া পরিধেয় বসন গুছাইয়া লইয়া নামি উঠিয়া বসিতে গেল, বৃদ্ধা নিবারণ করিলেন।

"না না ও রকম কোরো না। আমি ত আর বাইরের লোক নই, আমি এলুম বলে কিছু করতে হবে না। এই যে আবার তুমি বুনছিলে! ওটাও আর করতে পাবে না। অসুখ হলে নিজের যত্ন ছাড়া আর কিছু করতে নেই। তাকেওর জন্যে এ সব ভুলে গেলেও চলবে না, নামি। সাবধানে থেকে শীগ্‌গির সেরে ওঠো বাছা—"

"এই অনেক দিন থেকে বিছানায় পড়ে রয়েচি তাই—"

"এমনি করে কি মা'র সঙ্গে কথা কয়? আমি এ রকম ভালোবাসি না। তুমি যেন বাছা ভারি দূরে দূরে থাক!"

বৃদ্ধার মনে যাহা ছিল সমস্ত বলিলেন না। তিনি বলিতেন, আজকালকার বধূরা শাশুড়ীকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা করে না। নামির অন্তত একটি গুণ তিনি স্বীকার করিতেন—তাহার এ দোষ লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু আজ তিনি অন্য কিছু ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তাকেওর চিঠি পেয়েছ, না? কি লিখেছে?"

নামি বালিসের তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিল, খানিকটা অংশ তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল, "আসচে শনিবার আসবেন লিখেচেন।"

"তাই না কি?"

চিঠিখানির উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া বৃদ্ধা উহা ফেরত দিলেন। "হ্যাঁ, তোমাকে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবে, এ সব কথা কি লিখেচে! এই শীতের সময় ঘুরে ঘুরে বেড়ালে তোমার শরীর ভালো থাকলেও অসুখ হয়ে পড়বে। চুপ করে শুয়ে থাকলে সর্দ্দিকাসি শীগ্‌গিরই সেরে যাবে। তাকেও ছেলেমানুষ কি না তাই একেবারে ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ে! ডাক্তার ডাকানো, হাওয়া খেতে যাওয়া এই সব কথা বলে! ছেলেবেলায় অল্পস্বল্প অসুখে আমি ত কখনও বিছানায় শুই নি। যখন ছেলে হোলো তখনো দশ দিনের বেশী শুই নি। তাকেওকে লেখো তোমার জন্যে যেন না ভাবে, আমি ত এখানে রয়েচি।"

বৃদ্ধা হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ দেখিয়া তিনি যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তা বুঝা গেল। তিনি বাহির হইয়া যাইবার সময় নামি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "মাপ করবেন, উঠতে পারলুম না।" তারপর সে একটি নিশ্বাস ফেলিল।

মাতা যে পুত্রের পত্নীর উপর ঈর্ষান্বিত হইতে পারে এ কথা সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করে! কিন্তু পতির প্রত্যাবর্ত্তনের পর সে দেখিয়াছে, তাহার ও শাশুড়ীর মধ্যে কি একটা আশ্চর্য্য ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

সমুদ্রযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাকেও দেখিল নামির স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গেছে। তাহার অনুপস্থিতির সময় ভাবিয়া ভাবিয়াই যে এরূপ ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই! পত্নীর প্রতি স্নেহ ভালবাসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। পতির সোহাগ যত্নে

নামির সুখের আর অন্ত রহিল না, কিন্তু শ্বশ্রূঠাকুরাণী ঈর্ষান্বিতা হইতেছেন মনে করিয়া সে চিন্তিত হইয়া উঠিল। এমন স্বামীকে ভালবাসিয়া ও তাঁহার ভালবাসা পাইয়াও শাশুড়ীর চক্ষুশূল হওয়া কী বিড়ম্বনা!

"কাতো-সান আপনাকে দেখতে এসেছেন।"

পরিচারিকার কথা শুনিয়া নামি চক্ষু মেলিল। অভ্যাগতকে দেখিয়া মুখখানি তার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"এই যে ওচিজু-সান বেশ করেচ ভাই এসেচ।"

"আজকে কি একটু ভালো বোধ হচ্ছে?"

রেশমী হাত-ব্যাগ ও ক্রেপের মস্তকাবরণটি এক পাশে রাখিয়া শিমাদা-খোঁপা-বাঁধা একটি সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণী নামির বিছানার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার কৃশ তনু কালো ওভারকোটে ঢাকা, সুগঠিত ভ্রূযুগলের নীচে কালো চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে চিজু-কাতো, নামির মাসীমা ব্যারনেস কাতোর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

শৈশবে যখন তাহারা কিণ্ডারগার্টেন পড়িত সেই সময় হইতেই নামি ও চিজুর মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। নামির ছোট বোন বেচারি কোমা প্রায়ই অভিযোগ করিত যে তাহার একটিও খেলায় সঙ্গী নাই! নামির বিবাহের পর ইস্কুলের সঙ্গীরা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, রহিল কেবল চিজু। সে নামিদের বাড়ীর নিকটেই থাকিত। প্রায়ই সে নামির সহিত দেখা করিতে আসিত। তাকেওর সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি-কালে দুঃখভারপীড়িতা নামির নিঃসঙ্গ জীবন যখন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাকেওর প্রেমপূর্ণ পত্র ও চিজুর আগমনই তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিত।

ঈষৎ হাস্য করিয়া নামি কহিল, "আজ অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে, কিন্তু মাথাটা এখনো ভার, কাশীটাও কমচে না।"

"তাই ত! তা হলে ত ভাল নয়! বেজায় শীত পড়েচে!"

পরিচারিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রদত্ত আসনে সে নামির নিকটে গিয়া বসিল, ও হীরকাঙ্গুরীশোভিত হাত দুখানি আগুনে গরম করিয়া বার বার স্বীয় গোলাপী কপোলের উপর চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

"মাসীমা মেসোমশাই দু'জনেই ভালো আছেন?"

"হ্যাঁ ভালো। ভারি শীত পড়েচে, তাই তাঁরা তোমার জন্যে ভাবচেন। এই কাল রাত্তিরে আমাদের কথা হচ্ছিল যে, তুমি একটু সেরে উঠলেই তোমার জুসিতে হাওয়া খেতে যাওয়া দরকার। এতে তোমার নিশ্চয়ই উপকার হবে।"

"তাই না কি? তাকেও য়োকোসুকা থেকে লিখেচে যে আমার হাওয়া বদলানো দরকার।"

"তা হলে ত তোমার যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়া উচিত।"

"যাই বা না যাই শীগ্‌গিরই ত সেরে উঠব।"

"খুব সাবধানে থাকতে হবে তোমায়।"

পরিচারিকা চিজুর জন্য চা লইয়া প্রবেশ করিল।

"কানে, মা কোথায়? লোক এসেচে? কে? পাড়া-গাঁ থেকে এয়েচে? ও-চিজু-সান তোমার বোধ হয় আজ খুব অবসর আছে, কেমন? কানে, ওচিজুর জন্যে ভালো খাবার কিছু নিয়ে এস।"

"কেন! আমিত প্রায়ই আসি। আমার জন্যে আবার এত আয়োজন কেন?—যোসো" (একটি ছোট বাক্স বাহির করিয়া) "তোমার শাশুড়ী ভাতের পিঠে খেতে ভালোবাসেন, না? তাঁর জন্যে অল্প এনেচি। তাঁর কাছে লোক কেউ থাকে ত এর পরে নিয়ে যেও।"

"বেশ করেচ। তিনি খুব খুসি হবেন।"

তারপর চিজু কয়েকটি লাল কমলা লেবু বাহির করিল। "এই দেখ কেমন! এগুলি তোমার জন্যে। কিন্তু বেশী মিষ্টি নয় বোধ হয়।"

"বেশ বেশ! আমার জন্যে একটা ছাড়াও না ভাই।" চিজু তাহাকে একটি লেবু ছাড়াইয়া দিল। নামি সেটি পরম তৃপ্তির সহিত খাইতে খাইতে কপালের উপর পতিত চূর্ণ কুন্তলগুলি পিছনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

"অসুবিধে হচ্ছে, না? আলগা করে চুল বাঁধলেই হয়! দাঁড়াও ঠিক করে দিচ্ছি। বসতে হবে না।"

পাশের ঘর হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনিয়া সে ধীরে ধীরে নামির চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিতে লাগিল:—

"আমাদের কালকের সভার কথা তোমায় বলি নি, তোমার কাছেও চিঠি এসেছিল ত? খুব আমোদ করা গেছে, সকলেই তোমায় ভালোবাসা জানিয়েছে।" একটু হাসিয়া সে বলিতে লাগিল, "এই বছরখানেক আমরা ইস্কুল ছেড়েচি কিন্তু এরি মধ্যে আমাদের প্রায় বারো আনা বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেছে। ওকুবো-সান, হোন্দা সান, কিতাকোজিসান—এদের যদি দেখতে! মাথায় তাদের মারুমাগে খোঁপা, কী গম্ভীর! লাগচে না ত? তারা সব নিজের কথা নিয়েই ব্যস্ত। তারপর আমাদের তর্ক হল, ছেলের বিয়ে হলে তার বাপ মার সঙ্গে থাকা উচিত কি না—এই বিষয়ে। কিতাকোজি-সান বললে উচিত, তার মা কি গিন্নিপনা কিছুই জানা ছিল না, তার শাশুড়ী-ঠাকরুণ তাকে না কি খুব সাহায্য করে। ওকুবো-সান বললে উচিত নয়, তার শাশুড়ী—তুমি ত জানই, বেজায় খিটখিটে। হাসবো কত! তারপর আমিও তর্ক জুড়ে দিলুম। তারা বল্লে আমার বলবার কোনো অধিকার নেই, কারণ আমি এখনো তাদের দলের বাইরে। এখানটা বেশী কষা হল কি?"

"না না; কাল তা হলে খুব মজা হয়েচে বল! যার যেমন অভিজ্ঞতা সে তেমনি বলেছে আর কি! সব বাড়ী ত আর এক রকম নয়, একটা নিয়ম কেমন করে হয় বল। মাসী এক বার কি বলেছিলেন তোমার মনে পড়ে কি ওচিজু? তিনি বলেছিলেন যে, অল্প বয়সীরা একসঙ্গে থাকলে স্বার্থপর আর কুড়ে হয়ে পড়ে। আমার মনে হয় তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। বয়স্কদের অবহেলা করাটা উচিত নয়, তোমার কি মত?"

নামি মেয়েটি ছিল একটু ভাবুক-ধরণের, সংসার কি-ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা ছিল। পিতার উপদেশগুলি সে আগ্রহসহকারে শুনিত, বিমাতার ধরণধারণ তাহার পছন্দ হইত না। বাড়ীর গৃহিণী হইয়া যে-দিন নিজের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে সে সেই দিনের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু কাওয়াশিমা-পরিবারে আসিয়া দেখিল সবই উল্টা— স্বপ্নেও সে এরূপ ভাবে নাই। এখানে শাসন-কার্য্যটা সমস্তই বুড়ো-রাণীর হাতে, সে যেন নামেমাত্র রাণী! কিছুকাল এই নূতন অবস্থার অনুগত হইয়া শুভ দিনের অপেক্ষাতেই সে ছিল। কিন্তু যখন দেখিল সে স্বামী ও শাশুড়ীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইচ্ছামত পতির পরিচর্য্যা করিতে পারিতেছে না, তখন সে নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। তাহার বিমাতা পৃথক-বাসের পক্ষপাতী ছিলেন; নামি এক দিন মনে করিয়াছিল উহা দেশের উপযোগী নয়। কিন্তু এখন—এখন সে ভাবিত বুঝি বা বিমাতার মতটাই ঠিক। কিন্তু বহুদিন হইতে সযত্নে যে-মত পোষণ করিয়া আসিতেছিল তাহাও হঠাৎ পরিত্যাগ করা নামির পক্ষে অসম্ভব।

চিজু নামির চুল শাদা ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দিল। বিমাতার অধীনে দশ বৎসর, এবং শাশুড়ীর অধীনে প্রায় এক বৎসর যে

কাটাইয়াছে, সেই ভগ্নীর মনোভাব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"উনি কি এখনো রাগারাগি করেন না কি ?"

"হ্যাঁ, কখনো কখনো, কিন্তু অসুখ হয়ে পর্য্যন্ত ভালো ব্যাভারই করচেন। কিন্তু—তাকেওর কথা অত করে ভাবি এটা ওঁর ভালো লাগে না, মুস্কিল হয়েচে এই। তাকেও আবার বলে এখানে মা-ই হলেন রাণী তাঁর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করতে হবে আমাকে। যাক, এ সব কথা থাক্। হ্যাঁ, এইবার বেশ আরাম হচ্ছে ভাই, ধন্যবাদ। মাথাটা অনেক হালকা হয়ে এসেচে।" খোঁপায় হাত বুলাইতে বুলাইতে নামি শ্রান্তভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

চিরুণিখানি রাখিয়া দিয়া নরম কাগজে চিজু হাত মুছিয়া ফেলিল। ক্ষণকাল আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি ছোট বাক্স দেখিতে পাইল। বাক্সটি খুলিয়া কি একটি বাহির করিয়া বলিতে লাগিল—"কী চমৎকার! এটি দেখতে আমার এত ভালো লাগে! তাকেওর পছন্দটি খুব ভালো বলতে হবে, কেমন ?" (আসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) "শুজি কেবলি আমাকে ফরাসি নয় জর্ম্মন পড়তে বলে। সে মনে করে এর মত একটা ভাষা রাজনীতিবিদের স্ত্রীর জানা দরকার। কিন্তু যে শক্ত!" চিজুর ভাবী পতির নাম শুজি। সে বৈদেশিক বিভাগের একজন কর্ম্মচারী।

নামি হাসিয়া বলিল, "তোমার মাথায় 'মারুমাগে' খোঁপা দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়, কিন্তু 'শিমাদা' খোঁপায় তোমায় এমনি মানায়!"

"সত্যি ?"

চিজুর সুন্দর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া আসিল, অধরকোণে একটুখানি হাসি ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল।

"নামি-সান, তোমার মনে আছে বোধ হয় হাভিওয়ারা-সানকে? আমাদের এক বছর আগে যে ইস্কুল ছেড়েছিল?"

"আছে বৈ কি, যার সঙ্গে মাৎসুদাইরার বিয়ে হয়েছিল।"

"সে-ই। শুনচি কাল তাকে তার স্বামী ত্যাগ করেচে।"

"তাই না কি? কেন কি হয়েছিল?"

"শ্বশুর শাশুড়ী তাকে খুবই ভালোবাস্‌ত, কিন্তু মাৎসুদাইরার পছন্দ হোল না তাকে।"

"তার ত একটি ছেলে ছিল, না?"

"হ্যাঁ! কিন্তু তা হোলে কি হয়! মাৎসুদাইরা একটা খারাপ মেয়েমানুষের সঙ্গ নিয়ে এমন নির্লজ্জ ব্যাভার করতে লাগল যে, হাভিওয়ারা-সানের বাবা রেগে বল্লেন এমন লোকের সংস্রবে মেয়েকে রাখবেন না। তিনিই মেয়েকে নিয়ে গেছেন।"

"আহা! কেন পছন্দ হল না? লোকটা ত ভারি নিষ্ঠুর!"

"বাস্তবিক! কথাটা ভাবলে রাগ হয়। শ্বশুর শাশুড়ীর ভালবাসা পেয়েও স্বামীর ভালোবাসায় বঞ্চিত হওয়া কী দুর্ভাগ্যের কথা!"

নামি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

"একই ইস্কুলে একই ঘরে যারা পড়েছিল তারা এখন কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েচে, অদৃষ্টে কত কি ঘটচে! ভাবলে আমার ভারি দুঃখ হয়। ওচিজু ভাই, আমরা চিরকাল বন্ধু থাকবো, কেউ কাকেও ত্যাগ করবো না, কেমন?"

"আমারও প্রার্থনা তাই!"

অজ্ঞাতসারে তাহাদের হস্ত মিলিত হইল। কিছুক্ষণ পরে নামি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এখানে একলাটি যখন শুয়ে থাকি তখন কত কথাই যে ভাবি তা আর কি বলবো! একটা ভাবনার কথা তোমায় বলি, হেসো না কিন্তু। ধর অনেক বছর পরে আমাদের

অন্ত কোনো দেশের সঙ্গে লড়াই হবে আর জাপান জিতবে! তখন শুজি-সান বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্রী হয়ে সন্ধি করতে যাবে আর তাকেও আমাদের নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হয়ে শত্রুর বন্দরে বন্দরে জাহাজ রেখে দেবে—”

“আর আকাসাকার মেসোমশাই স্থল-সৈন্তের প্রধান সেনাপতি হবেন, আর আমার বাবা পার্ল্যামেণ্টে যুদ্ধের খরচের জন্তে কোটি কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়ে এক বিল পাশ করাবেন!”

“আর তখন ওচিজু-সান আর আমি ‘রেড-ক্রশের’ সভ্য হব!”

চিজু হাসিয়া বলিল, “কিন্তু গায়ে জোর না থাকলে ত তুমি তা করতে পারবে না!”

নামি যেই হাসিয়াছে অমনি কাশিতে লাগিল। দক্ষিণ বক্ষের উপর সে হাত রাখিল।

“আমরা বড্ড বেশী বকেছি! এখানে ব্যথা না কি?”

“কাশলে এই খানটায় লাগে,” বলিয়া নামি সন্ধ্যার ম্লানায়মান আলোকের দিকে চক্ষু ফিরাইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জুসি

হৃদয়ে হিংস লইয়া, হতমান চিজিওয়া গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের পাঁচ দিন পরে হঠাৎ সদরের আপিস হইতে একটা সৈন্তদলে বদলি হইয়া গেল।

জীবনে অন্তত এক বার এমন সময় আসে, যখন আমরা যে

কাজে হাত দিই তাহাই নষ্ট হইয়া যায়, অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া পড়ে,—যেন ভগবানের শাস্তির আর বিরাম নাই! গত বৎসর চিজিওয়ার অবস্থা ঠিক এইরূপই হইয়াছিল, এখনো সে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। নামিকে তাকেও ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল; ব্যবসায়ে লোকসান হইল; টাকা ধার করিতে গিয়া লাভ হইল অপমান; শেষে কি না যাহাকে সে সামান্য ছোকরা বলিয়া অবহেলা করিয়া আসিয়াছে সেই তাকেও তাহাকে অপদস্থ করিল! তাহার একমাত্র আত্মীয় কাওয়াশিমা-পরিবারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে। তারপর কথা নাই বার্ত্তা নাই, তাহার দ্রুত উন্নতির সোজা রাস্তা, সদরের চাকুরিটি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দেওয়া হইল সৈন্য-দলে একটা সামান্য কাজ—যা সে এতদিন দাস্যবৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে!

চিজিওয়া কিন্তু স্বীয় অপরাধের কথা ভালোরকমই বুঝিত, তাই কোনো প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া লইয়া সে নূতন কাজে মনঃসংযোগ করিল। এত দিন সে খুব ধীর-স্থির গোছের লোক ছিল, তাহার উপস্থিত বুদ্ধি কখনো লোপ পাইত না; কিন্তু শেষোক্ত ঘটনাটি তাহাকে এমন একটা ঘা দিয়া গেল যে অপমানের কথা মনে হইলে সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, তাহার রক্ত যেন ফুটিতে থাকে!

সোপানশ্রেণীর দু' এক ধাপ উঠিয়াছে এমন সময় সহসা সেখান হইতে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলে যেমন হয়, চিজিওয়ার জীবনের বর্ত্তমান অবস্থা সেইরূপ। কিন্তু তাহাকে ফেলিয়া দিল কে? তাকেওর কথার ভঙ্গী হইতে, এবং সদরের যিনি প্রধান তাঁহার সহিত লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল কাতাওকার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়া চিজিওয়ার সন্দেহ হইত যে, এ বিষয়ে কাতাওকার কিছু হাত ছিল।

সে জানিত তাকেও অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তবে তাহার তিন হাজার টাকার জন্য এত রাগ কেন! সে নয় তাহার নামের মোহরটি জাল করিয়াছে! ইহার মধ্যে অর্থের চেয়েও গভীরতর আরও কিছু নাই ত? সেই পুরাণো প্রেম-প্রার্থনার কথা নামি তাকেওকে বলিয়া দেয় নাই ত? যতই সে ভাবিতে লাগিল ততই তাহার সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রেম-পরাজয়, কার্য্য হইতে বিতাড়ন প্রভৃতি তাহার মনে যে দারুণ হিংসা ঘৃণা ও হতাশার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এখন জেনারেল, তাকেও ও নামির চারি দিকে আগুনের হল্কার মত লাফাইয়া উঠিল। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারে বলিয়া সে গৌরব করিত, এবং উত্তেজনার বশে যাহারা জ্ঞানশূন্য হয় তাহাদের মূর্খতা দেখিয়া বিদ্রূপ করিত। কিন্তু এখন—বার বার ব্যর্থকাম হইয়া মেজাজ তাহার এমনি বিগড়িয়া গেছে যে, সে ক্রোধ রাখিবার আর স্থান পাইতেছে না।

প্রতিহিংসা! যাহাদের ঘৃণা করি তাহাদের রক্তপানে যে আনন্দ তাহার তুলনা নাই। প্রতিহিংসা! কিন্তু কি করিয়া? বিস্ফোরক সংযোগে কেমন করিয়া কাতাওকা ও কাওয়াশিমা এই দুইটা ঘৃণ্য পরিবারকে উড়াইয়া দেওয়া যায়! এই ঘৃণ্য স্ত্রী-পুরুষগুলোর গায়ের মাংস টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে, হাড়গুলো গুঁড়া হইতেছে, আধমরা অবস্থায় তাহারা যখন মরণের পথে চলিয়াছে, তখন নিরাপদে দূরে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া এই চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করা যায়! এই কথাই গত জানুয়ারি মাস হইতে দিন রাত চিজিওয়ার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে।

মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি প্লামের ফুলগুলি যখন তুষারকণার ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছিল তখন চিজিওয়ার এক বন্ধু তোকিওতে বদলি

হইয়া আসিতেছিলেন। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চিজিওয়া শিন্‌বাশি ষ্টেশনে গিয়াছিল। বিশ্রাম-কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়াই মহিলাদের ঘরের সম্মুখে একটি দীর্ঘকায়া স্ত্রীলোক ও একটি তরুণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

"কেমন আছ ?"

কাতাওকা-গৃহিণী ও কোমা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। মুহূর্ত্তের জন্য চিজিওয়া বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহাদের মুখ দেখিয়া বুঝিল, তাঁহারা তার কার্য্যাবলীর কথা অবগত নহেন; তাই তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইল। জেনারেল ও নামির উপরই তাহার রাগ! কাতাওকা-গৃহিণীর সহিত শত্রুতা করিয়া কোনো লাভ নাই! তাই সে সবিনয় নমস্কার করিয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কেমন আছেন ?"

"তোমার ত আর দেখাই পাওয়া যায় না।"

"দেখা কর্‌ব মনে করেছিলুম, কিন্তু ভারি ব্যস্ত ছিলুম তাই পারি নি। কোথায় চলেছেন ?"

"জুসি। তুমি কোথায় যাবে ?"

"এই একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেচি। বেড়াতে যাচ্ছেন না কি ?"

"কেন, তুমি শোন নি না কি ? রোগী দেখতে যাচ্চি।"

চিজিওয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "রোগী কে ?"

ভাইকাউণ্টেস বলিলেন "নামি।"

ঘণ্টা বাজিল। আরোহীর দল বন্যার মত প্ল্যাটফর্ম্মের ফটকের দিকে ছুটিয়া চলিল। কোমা কহিল "সময় হয়েছে শীগ্‌গির চল।"

ভাইকাউণ্টেসের হাত হইতে থলিটি লইয়া চিজিওয়া তাঁহার পাশে পাশে চলিল।

"অসুখ বেশী না কি ?"

"হ্যাঁ বুকের অসুখ।"

"যক্ষ্মা ?"

"মুখ দিয়ে ভয়ানক রক্ত পড়েছিল তাই সে দিন জুসি গেছে। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি।" ফটকের নিকট গিয়া চিজিওয়ার হাত হইতে থলিটি নিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "চল্লুম। শীগ্‌গির ফিরব। এসো এক দিন দেখা করতে।"

চিজিওয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, সুন্দর কাশ্মীরী শাল ও লালফিতা-বাঁধা-খোপা একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তারপর সে ফিরিল। তখন মুখে তাহার প্রতিহিংসার হাসি ফুটিয়াছে।

নামির রোগের লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। চিকিৎসক যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইতে লাগিল। মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে বেশ বুঝা গেল যে, তাহার যক্ষ্মা রোগ হইয়াছে। এমন কি নামির শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী, যিনি এতাবৎকাল স্বীয় স্বাস্থ্যের গৌরব করিয়া আসিয়াছেন এবং জলহাওয়া বদলের দ্বারা রোগের প্রতিকার ছেলেমানুষের আজগবি কল্পনা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, তিনিও নামির রক্ত-বমন দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এই ভয়ানক রোগটা ছোঁয়াচে তাহাও তিনি শুনিয়াছিলেন, তাই পরিণাম-ভয়ে ভীত হইয়া চিকিৎসকের উপদেশ-মত নামিকে উপযুক্ত সেবিকার সঙ্গে জুসিতে কাতাওকার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রোগের প্রথম আক্রমণটা দেখিয়া নামি ত্রস্ত ও চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল সে যেন এক বর্ষণোন্মুখ ঘনকৃষ্ণ মেঘাস্তরণে আবৃত জনহীন অসীম প্রান্তরের মধ্য দিয়া একাকিনী চলিয়াছে! কিন্তু এক্ষণে ভয়ানক স্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়াছে; নামি

বজ্রবিদ্যুত উদ্দাম বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া! এখন সে ভাবিতেছে যেমন করিয়া হউক ঝড়-ঝঞ্ঝার আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবেই হইবে। কিন্তু তবুও রোগের সেই প্রথম আক্রমণের কথা মনে হইলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

সে দিন মার্চ্চ মাসের দোসরা। নামি খুব সুস্থ বোধ করিতেছিল। সে ফুল সাজাইতেছিল। বহু দিন এ কাজ সে করে নাই। তাকেও বাড়ী ছিল, তাহাকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনিতে বলিয়া বারান্দায় বসিয়া সে একটি সুন্দর স্ফুটনোন্মুখ লাল প্লাম গাছ হইতে ডাল বাছিয়া লইতেছিল। হঠাৎ তাহার বুকে একটা ব্যথা বোধ হইল, মাথা ঘুরিয়া গেল, চীৎকার করিয়া সে ঢলিয়া পড়িল। দারুণ শঙ্কার সহিত সে যে-সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল অবশেষে তাহা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই বার তাহার মনে হইল, সে যেন দূরে অস্পষ্টভাবে মৃত্যুর দ্বার দেখিতে পাইয়াছে।

হায় মৃত্যু! নামি যখন অসহায় শিশু তখন জীবনে তাহার সুখ ছিল না, মরণেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু এখন সে জীবনে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে, এখন জীবনের অবসান কল্পনা করা কী ভয়ানক! তাই মৃত্যুর কথা মনে হইলেই সে ভাবিত, উহার বিরুদ্ধে সে প্রাণপণ যুদ্ধ করিবে। দুর্ব্বল চিত্ত দৃঢ় করিয়া চিকিৎসকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া সে বিশেষ আগ্রহ সহকারে শরীরের যত্ন করিতে লাগিল।

তাকেও সে সময়ে জুসির নিকটবর্ত্তী য়োকোস্থকা নামক নৌনিবাসে থাকিত। একটু সময় পাইলেই সে ছুটিয়া নামিকে দেখিতে আসিত। পিতার নিকট হইতে পত্র আসিত, মাসীমা ও চিজু প্রায়ই তাহাকে দেখিতে আসিতেন। তারপর তাহার বৃদ্ধা ধাত্রী ইকু এমন স্নেহের সহিত তাহার পরিচর্য্যা করিতেছিল যে, নামি পীড়ার দুঃখের মধ্যেও আনন্দ অনুভব করিত। গত গ্রীষ্মকালে কাওয়াশিমা-পরিবার হইতে

বিতাড়িত হইয়া অবধি ইকুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পীড়া না হইলে ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত না, এই কথা ভাবিয়া নামির আনন্দ হইত। আর এক জন পুরাতন অনুরক্ত ভৃত্য তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সদাই ব্যাপৃত থাকিত।

শীতের সময় সহর ছাড়িয়া নামি রৌদ্রালোকিত তটভূমির সুখোষ্ণ আশ্রয়ে আসিয়াছিল। উদার প্রকৃতির তপ্ত আলোক ও মানুষের প্রীতির বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া নামি সুস্থ বোধ করিল। দুই সপ্তাহ পরে রক্ত-বমন বন্ধ হইল, কাশিও কমিয়া গেল। সপ্তাহে দুই বার তোকিও হইতে চিকিৎসক আসিতেন। রোগ না সারিলেও বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া তিনি সুখী হইলেন, এবং নামিকে কহিলেন, সহিষ্ণুতার সহিত চিকিৎসকের শুশ্রূষাধীনে থাকিলে ও উদ্বেগশূন্য হইলে তাহার সারিয়া উঠা অসম্ভব নয়।

এপ্রিল মাসের প্রথম শনিবার। রাজধানীতে চেরি ফুল ফুটিবার বিলম্ব থাকিলেও এখানে পাহাড়ের উপর বন্য চেরি গাছগুলিতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। পাহাড়ের সবুজ গায়ে মাঝে মাঝে সাদা ছাপ পড়িয়াছে। আজ কিন্তু প্রকৃতির মূর্ত্তি বিষণ্ণ। প্রত্যুষ হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। পাংশুবর্ণ কুয়াশায় পাহাড় ও সমুদ্র এক হইয়া গিয়াছিল, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বসন্তের দীর্ঘ দিনের আর যেন অবসান হয় না! সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, বাতাস বহিতে লাগিল, দরজা জানালার মধ্য দিয়া ঝটিকা হাহা রবে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ সাগরের গর্জ্জন শুনিয়া মনে হইতেছিল, যেন লক্ষ লক্ষ বন্য তুরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে! ধীবরপল্লীর সকল গৃহের দ্বার রুদ্ধ, তাহাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য একটি আলোকও জাগিয়া নাই।

কাতাওকার বাড়ীতে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। সেখানে তাকেওর

অভ্যর্থনা চলিতেছে। তাহার সকাল সকাল আসিবার কথা ছিল, কিন্তু কার্য্যগতিকে বিলম্ব ঘটায় ঝটিকাসঙ্কুল রাত্রের অন্ধকারের মধ্য দিয়া সে আসিয়াছে। পোশাক পরিবর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যার আহার সারিয়া সে এখন একটি টেবিলের ধারে বসিয়া আছে, অপর দিকে বসিয়া নামি একটি সুন্দর থলি সেলাই করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে সেলাই থামাইয়া পতির দিকে চাহিয়া সে মৃদু হাস্য করিতেছিল, কখনো বা নীরবে বাহিরের শব্দ শুনিতেছিল। এক গুচ্ছ চেরি ফুল ও পাতা তাহার কেশে আবদ্ধ। টেবিলের উপর একটি আলোক আবরণের মধ্য হইতে গোলাপী আভা ছড়াইতেছিল। নিকটে একটি ফুলদানিতে এক গুচ্ছ চেরি পুষ্প। তুষারের মত ফুলগুলি অবসন্ন ভাবে ধীরে ধীরে নুইয়া পড়িতেছিল। সে-দিন প্রভাতে পাহাড়ের মাথায় যে-বসন্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে ফুলগুলি বোধ হয় তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিল!

বৃষ্টির ঝাপট ও বাতাসের সন্ সন্ শব্দ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে শুনা যাইতেছিল।

তাকেও চিঠিখানি মুড়িয়া কহিল, "বাবা তোমার জন্যে ভারি চিন্তিত হয়েছেন। কাল আমায় তোকিও যেতে হবে, আকাসাকাতেও যেতে চেষ্টা করব।" "কাল যাবে? এই বৃষ্টি বাদলায়? ও! মা যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন! তোমার সঙ্গে আমারও যেতে ইচ্ছে করচে।"

"নামি-সান! এখানে তুমি কেন এসেচ সে কথা ভুলো না। মনে কর, কিছু দিনের জন্যে তুমি বনবাসে এসেছ।"

"এ যদি বনবাস হয় ত সারা জীবন এখানেই কাটাতে ইচ্ছে করে। তুমি চুরুট খেতে পার। শুন্‌চ!"

"আমাকে দেখে বোধ হচ্ছে কি আমি চুরুট খেতে চাইচি?

না এখানে চুরুট না খাওয়াই ভালো। কিন্তু এখানে আসবার এক দিন আগে আর পরে সাধারণত যা খাই তার ডবল খাবো, কেমন ?”

নামি হাসিয়া বলিল, “তুমি যখন এমন ভালো ছেলে তোমাকে খান কতক ভালো কেক খাওয়াই। ইকু আনবে এখন।”

“ধন্যবাদ। কেকও চিজু-সান এনেছিল না কি ? ওকি ? বেশ সুন্দর ত !”

“সময় কাটাবার জন্যে মার জন্যে এটি তৈরি করচি। না না এতে আমার কষ্ট হবে না। আস্তে আস্তে করচি বই ত নয়। আজ আমার খুব ভালো বোধ হচ্ছে। ওগো ! আজ আমায় একটু বেশীক্ষণ জেগে থাকতে দাও না। আমাকে আর ব্যারামীর মত দেখায় না, দেখায় কি ?”

তাকেও হাসিয়া বলিল, “ডাক্তার কাওয়াশিমা যখন উপস্থিত তখন তোমার ভালো বোধ হওয়া খুবই উচিত। না না বাস্তবিক আজকাল তোমায় অনেকটা ভালো দেখাচ্ছে। আর কোনো ভয় নেই।” চা ও কেক লইয়া বৃদ্ধা ইকু প্রবেশ করিল। সে কহিল, “কী ঝড়টাই বইচে ! কর্ত্তা না এলে আজ রাত্তিরে ঘুমুনো দায় হোত ! চিজু দিদি চলে গেছেন, দাইও তোকিও ফিরে গেছে। বুড়ো মোহেই আছে বটে, কিন্তু ওরা না থাকলে এমন একলা বোধ হয় !”

নামি কহিল, “এমন দিনে সমুদ্রে নাবিকের অবস্থাটা কি রকম ! কিন্তু আমার মনে হয় নাবিকের জন্তে বাড়ীতে বসে যে ভাবে তার অবস্থাই আরো শোচনীয়।”

এক পেয়ালা চা পান করিয়া ও টপ টপ করিয়া খান তিনেক কেক খাইয়া ফেলিয়া তাকেও কহিল, “হুঃ, এ আর এমন কি ঝড় ! দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে যদি দিন দুই তিন একটা বড় ঝড়ের মধ্যে পড়তে ত ঝড় কা'কে বলে তা বুঝতে। চার হাজার টনের বড় জাহাজ

মোচার খোলার মত টলটল কর্‌ত, পাহাড়ের মত ঢেউগুলো ডেক ধুয়ে দিয়ে যেত, জাহাজের খোলটা কাঠের বাড়ীর মত ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ কর্‌ত। নিশ্চয় বলতে পারি সেটা বিশেষ আরামের নয়।"

ঝড়ের বেগ বাড়িয়া উঠিল। একটা দম্‌কা বাতাস বাড়ীর গায়ে বৃষ্টির ঝাপটা মারিল, পাথরের নুড়ির বর্ষণ হইলে যেমন শব্দ হয় তেমনি শব্দ হইল। নামি চক্ষু মুদ্রিত করিল, ইকু ঘাড় কাঁপাইল। তাহারা কথোপকথন থামাইয়া কিছুক্ষণ কেবল ঝড়ের ভীষণ ধ্বনি শুনিতে লাগিল।

"নিরানন্দ বিষয়ের আলোচনা আর ক'রে কাজ নেই। এমন দুর্য্যোগে বাতির আলো উজ্জ্বল করে দিয়ে আনন্দের কথাবার্ত্তা কওয়াই ভালো। এ জায়গাটা য়োকোস্থকার চেয়েও গরম। এরি মধ্যে বুনো চেরি গাছ গুলোতে এই রকম ফুল ফুটেচে।" ফুলগুলি ফুলদানিতে রাখিয়া নামি বলিল, "আজ সকালে মোহেই বুড়ো পাহাড় থেকে এগুলি এনেচে। কেমন, সুন্দর নয়? ঝড় বৃষ্টিতে পাহাড়ের উপরকার গাছগুলোর ভারি ক্ষতি হবে। কিন্তু ফুলগুলি কেমন নির্ভীক! হ্যাঁ হ্যাঁ আজই বিকেলে রেঙ্গেৎসুর এই সুন্দর কবিতাটি পড়্‌ছিলুম—

"ফুটে ফুল মনের হরষে
তার পর ঝরে পড়ে যায়;
ভয় তবু নাই তার প্রাণে,
ঝরে যায় হাসিয়া উধায়।"

তাকেও কহিল, "কি? বীরের মত পড়ে যাচ্চে? আমরা ফুল আর অন্যান্য জিনিসের ঝ'রে পড়াটা খুব তারিফ করি। তারিফ করাটা মন্দ নয়, কিন্তু এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাটা আবার কিছু নয়। যুদ্ধে বা আর কোনো কাজে শীগ্‌গির ম'রে যাওয়া মানে

হেরে যাওয়া। আমাদের লোকেদের চরিত্রের দুর্দ্দমনীয় একগুঁয়ে সহিষ্ণু দিকটারই আমি তারিফ করতে চাই। শোন। আমার গানটা হবে এই রকম। শুনতে একটু অদ্ভুত হবে যদিও, এই আমার প্রথম চেষ্টা কি না—

"বসন্ত ফুরায়
ফুল তবু নাহি ঝরে যায়।
ঝরে গিয়ে কোন ফল নাই,
ফুটে থাকা চাই।
ঝরে গিয়ে কিবা ফল বল?
বেঁচে থেকে কাজ করা ভাল!"

"কেমন? রেঙ্গেৎসুকে হারিয়েচি কি না বল?" ইকু বলিল "বাঃ! কর্ত্তা দেখচি রীতিমত কবি। কেমন নয় কি দিদি?"

তাকেও আনন্দিত হইয়া বলিল, "ইকু যখন মঞ্জুর করেচে তখন আর কি! কে বলে আমি কবি নয়!" ক্ষণেকের জন্য কথোপকথনের বিরাম হইল। ঝড়ের ও ঢেউয়ের মিলিত শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। তাহাদের মনে হইতেছিল, তাহারা যেন তরণী মধ্যে বসিয়া উদ্দাম সাগরবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে! ইকু কেতলিতে জল আনিতে বাহির হইয়া গেল। নামি বুকের মধ্য হইতে থার্ম্মমিটারটি বাহির করিয়া লইয়া আলোয় দেখিয়া স্বামীকে সানন্দে বলিল, "শরীরের তাপ সাধারণত যা থাকে তার চেয়েও কম।" তারপর কিছুক্ষণ টেবিলের উপরে ফুলগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ তাহার অধরে একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে বলিল, "ঠিক এক বছর হোল, দিনটা আমার বেশ মনে পড়ে, আমি গাড়ী চড়ে তখন বেরুচ্চি, বাড়ীর লোকেরা তুলে দিতে এসেচে। বিদায়-সম্ভাষণ করতে গেলুম, মুখে একটা কথাও জোগাল না। আমেইকের পোল যখন পার হলুম তখন সন্ধ্যা

হয়ে এসেচে, চাঁদ উঠেছে। অদূরে পাহাড়ের ওপর চেরি ফুল খুব ফুটে ছিল, গাড়ীখানা যখন সেখান দিয়ে গেল তখন ফুলের পাপড়ীগুলো বরফের মত ঝির্ ঝির্ করে ঝ'রে পড়ে' নাচতে নাচতে গাড়ীর জানলার ভেতর দিয়ে এসে পড়তে লাগলো। একটা পাপড়ি আমার চুলে আটকে গিয়েছিল, আমি কিছুই জানতে পারি নি। নামবার সময় মাসীমা যখন তুলে নিলেন তখন দেখতে পেলুম।"

তাকেওর হাতের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, "বছর খানেক সময় কী শীগ্‌গিরই কেটে যায়? বিয়ের সময় তুমি কী স্থির হয়ে ছিলে ভাবলে আমার হাসি পায়। আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হ'ত কেমন করে তুমি অত গম্ভীর হ'তে পেরেছিলে।"

তাকেও কহিল, "তুমি যে অবাক হয়ে গিয়েছিলে তা আমি জানি। সত্যি বল্‌ব? আমার এমন ভয় হয়েছিল যে পেয়ালাটাও ধরে রাখতে পারছিলুম না।"

ইকু হাস্যমুখে কেতলি লইয়া প্রবেশ করিল। বলিল, "তোমাদের আনন্দ দেখে এত সুখ আমার কখনো হয় নি। গেল বছর 'ইকাও'এ থাকার কথা মনে হচ্ছে।"

নামি কহিল, "ইকাও! আহা, কী আমোদটাই হয়েছিল!" তাকেও জিজ্ঞাসা করিল, "আর ফার্ণ তোলা? একটি মেয়ের কথা আমার মনে আছে—সে এত দেরি করছিল!"

"আর তুমি আমায় এমন তাড়া দিচ্ছিলে!"

"ফার্ণের সময় এল ব'লে। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, আবার আমরা ফার্ণ তুলতে যাব।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি সেরে উঠব।"

রাত্রের ঝড়ের পর পরদিন আকাশ নির্ম্মল হইয়া দেখা দিল।

বৈকালে তাকেওকে তোকিও যাইতে হইবে। সেই উষ্ণ শান্ত

প্রভাতে একটু বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়াতে সে নামিকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর পিছন দিক দিয়া একটি দেবদারু-গাছে-ঢাকা বালুকাময় পাহাড় অতিক্রম করিয়া সমুদ্র-তীরে চলিয়া গেল।

নামি কহিল, "কি সুন্দর দিন! কাল রাত্তিরে মনে হয় নি যে আজ এত পরিষ্কার হবে।"

তাকেও উত্তর দিল, "না। দেখ ওপারের তীর কত কাছে বলে বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এখান থেকে ডাকলে ওপার থেকে শোনা যাবে!"

বালুকাময় তীরভূমি ইহারই মধ্যে শুষ্ক হইয়া গেছে। কয়েকটি শিশু ঝিনুক কুড়াইতেছিল, জেলেরা জাল ফেলিবার উদ্যোগে ব্যস্ত। উভয়ে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার তীরভূমির উপর দিয়া একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া পৌঁছিল।

হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়িল এমনি ভাবে নামি জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, চিজিওয়া আজকাল কি করচে জান কি?"

"চিজিওয়া? সেই নির্লজ্জটা! সেই অবধি আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। কেন? তার কথা জিজ্ঞাসা করচ কেন?"

নামি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "শুনলে তুমি হাসবে। কাল রাত্তিরে তাকে স্বপ্নে দেখেচি।"

"তাকে স্বপ্নে দেখেচ?"

"হ্যাঁ, সে মার সঙ্গে কথা কইছিল।"

তাকেও হাসিয়া বলিল, "তুমি এই সব বিষয় নিয়ে বড় মাথা ঘামাও। সে বলছিল কি?"

"তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু মা অনেক বার মাথা নাড়লেন। ও-চিজুসান বলছিল যে, সে তাকে য্যামাকির সঙ্গে বেড়াতে দেখেচে। বোধ হয় সেই জন্তে স্বপ্নটা দেখেচি। হ্যাঁগা চিজিওয়া-সান আমাদের বাড়ী আসবে না ত?"

"সে কথনো আসবে না। মাও তার ওপর রেগেচেন।"

নামি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

"আমি সদাই ভাবি আমার অসুখ হওয়াতে মা বড় বেজার হয়েচেন।"

বেদনায় তাকেওর অন্তর টন্ টন্ করিয়া উঠিল। নামি চলিয়া আসার পর হইতে তাহার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী যে তার উপর উত্তরোত্তর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যে পুত্রকে ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে জুসি হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন, নামির পীড়া হওয়াতে যে-সব অসুবিধা ঘটিয়াছে তজ্জন্য অভিযোগ করিয়া থাকেন, এমন কি কাতা-ওকা পরিবারের নিন্দা পর্য্যন্ত করেন—এ সব কথা তাকেও তাহার পীড়িতা পত্নীকে বলে নাই। মাতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে তিনি তাকেওকে নির্ব্বোধ বলিতেন; স্ত্রীর জন্য সে মাতার অবাধ্য হইতেছে, এমন কথাও বলিতেন। একাধিক বার এরূপ ঘটিয়াছে।

"তুমি কেবলই ভাবো! মনের জোর কর, ভালো হয়ে ওঠো। আসচে বসন্তের জন্যে প্রস্তুত হও। মাকে নিয়ে আমরা য়োশিনোতে চেরি ফুল দেখতে যাব। তাইত, আমরা যে অনেকটা এসে পড়েছি! ক্লান্তি বোধ করচ কি? ফেরা যাবে না কি?"

বালুকাময় তীরভূমি যেখানে পাথরের পাহাড় হইয়া উঠিয়াছে সেই খানে তখন উভয়ে দাঁড়াইল।

"ফুদোয় যাওয়া যাক চল। আমি একেবারেই হাঁপাই নি। মনে হচ্চে যেন আমেরিকা পর্য্যন্ত হাঁটতে পারি!"

"ঠিক ত? তবে এই শালখানা গায়ে দাও। পাথর গুলো পিছল, আমার হাত ধরে চল।"

তাকেও নামিকে ধরিয়া পাহাড়ের উপর একটা সরু পথ দিয়া চলিতে লাগিল। রাস্তায় সে অনেক বার থামিল, অবশেষে উপরে

হইতে যেখানে একটি ক্ষীণ জলধারা পড়িতেছিল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রপাতটির ধারে ফুদোর এক মন্দির, যেন সমুদ্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

একখানি পাথরের উপর হইতে ধুলা ঝাড়িয়া নামির বসিবার জন্য তাকেও শালখানি পাতিয়া দিল। সে নিজে তাহার পাশে বসিয়া হাঁটুর উপর হাত দুখানি রাখিয়া কহিল, "আঃ চারি দিকে কী শান্তি!"

বাস্তবিকই সমুদ্র বড়ই শান্ত। মধ্যাহ্নের আকাশে মেঘের কণা মাত্র ছিল না, আকাশের অন্তস্থল পর্য্যন্ত নীল। বিরাট সমুদ্র স্থানে স্থানে শ্বেত রেশমী চাদরের মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল, যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় একটিও ঢেউ নাই—জলস্থল স্বপ্নাবিষ্টের মত স্থির হইয়া আছে।

নামি ডাকিল "প্রিয়তম!"

তাকেও বলিল "কেন নামি?"

"একি ভালো হবে?"

"কি?"

"আমার অসুখ।"

"কী বল! ভালো হবে না কেন? নিশ্চয়ই ভালো হবে। আমি ভালো কর্‌ব তোমায়!"

স্বামীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নামি কহিল, "আমি কিন্তু অনেক সময় ভাবি যে আমি কখনো ভালো হব না। মা আমার এই ব্যারামে মরেছিলেন; আর—"

"নামি-সান তুমি আজ এ সব কথা কেন বল্‌চ? নিশ্চয়ই তুমি সেরে উঠবে। ডাক্তার এই কথা বলেছিলেন, শুনেচ ত? তোমার মা সেই অসুখেই হয়ত—কিন্তু তোমার বয়স কুড়ি বছরের নীচে, ব্যারামের এই প্রথম অবস্থা, নিশ্চয়ই তুমি ভালো হয়ে যাবে।

আমাদের আত্মীয় ওকাহারাকে জান ত? তার ডানদিকের ফুসফুস সমস্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারেরা তার আশা ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু তবুও সে পনর বছর বেঁচে ছিল। তোমার মনের যদি জোর থাকে ত তুমি ভালো হবে। তা যদি না হয় ত বুঝব তুমি আমায় ভালোবাস না। আমায় ভালোবাসলে তুমি সারবেই সারবে। কেমন ভালো হবে ত?"

নামির দক্ষিণ হস্ত লইয়া তাকেও আবেগের সহিত ওষ্ঠে চাপিয়া ধরিল। তার আঙুলে তাকেও-প্রদত্ত হীরকাঙ্গুরী দীপ্তি পাইতেছিল।

উভয়ে ক্ষণকাল নীরব রহিল। রেনোশিমার দিক হইতে একখানি শাদা পাল বাহির হইয়া অচঞ্চল সমুদ্রের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। জেলেদের হর্ষ-সঙ্গীত স্থির বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

নামির সজল চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "হ্যাঁ আমি সেরে যাব। নিশ্চয়ই সার্‌ব। আচ্ছা মরণ আসে কেন? আমার হাজার বছর বাঁচতে ইচ্ছা হয়! মরতেই যদি হয় আমরা দুজনে এক সঙ্গে মর্‌ব।"

"তুমি গেলে আমিও যাব।"

"সত্যি? আহা এক সঙ্গে মরতে কত সুখ! কিন্তু তোমার মা আছেন, কর্ত্তব্য কাজ আছে, তুমি ত তোমার ইচ্ছামত কিছু করতে পারবে না। আমিই প্রথমে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ব। আমি চলে গেলে তুমি আমার কথা ভাববে ত? হ্যাঁ গা! ভাববে না?"

তাকেওর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। নামির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সে কহিল, "এসব দুঃখের কথা আর কয়ে কাজ নেই। নামি-সান তুমি ভালো হয়ে ওঠো। আমরা এখনো ঢের দিন বেঁচে থাকবো।"

তাকেওর হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া নামি কাঁদিয়া বলিল, "আমি মলেও তোমারই! কেউ আমাদের পৃথক করতে পারবে না—শত্রু নয়, রোগ নয়, মরণ নয়! চিরকাল আমি তোমার—তোমারই!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতিহিংসা

শিন্‌বাসি ষ্টেসনে নামির পীড়ার কথা শুনিয়া চিজিওয়ার অধরে যে হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তা অমীমাংশিত সমস্যা সমাধানের একটা অভাবিত পথ খুঁজিয়া পাওয়ার আনন্দই সূচিত করিতেছিল। কাওয়াশিমা ও কাতাওকা, এই দুইটা ঘৃণ্য পরিবারকে সংযুক্ত করিয়াছে নামি! সেই নামির পীড়া—প্রতিশোধ লইবার এমন সুযোগ আর আসিবে না! পীড়াটা ছোঁয়াচে ও মারাত্মক, তাকেও উপস্থিত নাই—সবই তাহার মতলবের অনুকূলে! বিধবা ও তাঁর পুত্রবধূর মধ্যে কেবল দুই একটা কথা বলা—ব্যস্! বোমা যদি তৎক্ষণাৎ ফাটে ত সে কেবল লম্ফ দিয়া পার্শ্বে সরিয়া যাইবে ও একটা নিরাপদ স্থান হইতে সমস্ত দুর্ঘটনাটা দেখিয়া লইবে। দেখিবে রক্তাক্ত কলেবরে কেমন তাহারা ছট্‌ফট্ করে! প্রতিহিংসার চিন্তা চিজিওয়ার অবসন্ন চিত্ত উৎসাহিত করিয়া তুলিল।

সে তার মাসীর স্বভাব ভালরূপেই জানিত। তাকেও তার উপর যতটা বিরক্ত তিনি ততটা নন; তাকেওকে সামান্য বালক জ্ঞানে তিনি যে অবজ্ঞা করেন এবং তাহার উপদেশ সংসারাভিজ্ঞ

লোকের উপদেশ বলিয়াই গ্রহণ করেন, ইহাও তাহার জানা ছিল। সে আরও বুঝিত মাসীর আত্মীয় কেহ নাই; তরুণ দম্পতির সহিত তাঁহার মত মিলে না; এবং সেই হেতু তাঁর যতই তেজ থাকুক না, কেহ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করে ইহাই তিনি চাহেন। সেই জন্য মতলব-টিকে পাকাইবার জন্য এক পদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, সে-যে সফলকাম হইবে সে বিষয়ে তার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

সর্ব্বপ্রথমে চিজিওয়া কাওয়াশিমা-পরিবারের অবস্থা দেখিবার জন্য ও সে-যে কতকটা অনুতপ্ত সেই মিথ্যা সংবাদ রটাইবার জন্য য়্যামাকিকে মধ্যে মধ্যে সেখানে প্রেরণ করিত। এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে এক দিন রাত্রে সে শুনিল যে, দুই মাসের চিকিৎসার পরও নামির অবস্থা কিছুমাত্র ভাল নয় ও তাহার উপর মাসীর অসন্তোষ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। তাকেও অনুপস্থিত, কার্য্যগতিকে ভাণ্ডারী তাজাকিও কোথায় গিয়াছিল, এই সুযোগে চিজিওয়া এক দিন কাওয়াশিমার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বহুদিন সে এ বাড়ীতে আসে নাই। দেখিল মাসী তাকেওর একখানি পত্র হাতে লইয়া চিন্তামগ্নভাবে একাকিনী বসিয়া আছেন।

বিধবা কহিলেন, "কোনো ফল হয় নি, ডাক্তার খরচাও ত কম হোল না! দু মাসের ওপর হয়ে গেল কিন্তু সারবার নামটি নেই! কি যে করব কিছুই ত ভেবে পাই না। এক জনের সঙ্গে পরামর্শ করতে পেলেও হোত, কিন্তু তাকেও এখনও যেন ছেলেমানুষ—"

"মাসীমা আমি তোমার দুঃখে দুঃখী। আমার এখানে আসা উচিত নয় তা বেশ বুঝি, কিন্তু কাওয়াশিমা-পরিবারের এই মহা বিপদের সময় ত আর চুপ করে থাকা যায় না! তুমি, তাকেও-সান আর মেশোমশাই আমাকে কত আদর যত্ন করেচ সে সব কথা কি আমি ভুলতে পারি! সেই জন্যেই সাহস করে এসেচি। কি

আর বল্‌ব মাসী, যক্ষ্মার মত এমন ভয়ানক ব্যারাম ত আর নেই এমন অনেক শোনা গেছে যে, স্ত্রীর কাছে থেকে স্বামীর ব্যারাম হয়েছে সমস্ত পরিবার লোপ পেয়েছে। তাকেও-সানের জন্যে ভারি ভাবনা হয়েচে, তুমি যদি সাবধান না হও ত এ থেকে একটা বিষম কাণ্ড হবে বলে রাখচি।”

“ঠিক কথা বলেচ। আমারও ত তাই ভয়, তাকেওকে জুসি যেতে বারন করে দিয়েচি। কিন্তু সে ত আমার কথা শুনবে না! এই দেখ না” (হস্তস্থিত পত্রখানির দিকে দেখাইয়া) “স্ত্রীর কথা ছাড়া আর কিছু নেই। ডাক্তার কি বল্‌লে, দাই কি করলে—খালি এই!”

ঈষৎ হাস্য করিয়া চিজিওয়া কহিল, “তা আর কি করবে বল মাসী। স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসার কি কোনো সীমা আছে? পীড়িতা স্ত্রীর ওপর তাকেও-সানের এই যে যত্ন—এ তো খুব ভালো কথা!”

“তা নয় হল। কিন্তু স্ত্রীর অসুখের জন্যে মার অবাধ্য হওয়া এ কোন্ দেশী কথা বাপু?”

চিজিওয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল—

“কত রকমই দেখলুম! এই সে দিন মনে করলুম তাকেওর বিয়ে বেশ ভালোই হল, তুমিও খুসি হয়েছিলে। কিন্তু কাওয়াশিমা-পরিবারে এখন এমন একটা সময় এসেচে যে ভালো হবে কি মন্দ হবে কিছুই বলা যায় না। ওনামিসানের মা বাপও নিশ্চয়ই তোমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করচেন?”

“হ্যাঁ তা আর করচেন না! দেমাকে গিন্নি একটা সামান্য উপহার নিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন! কাতো দু' তিন বার এসেছিল, কিন্তু—”

চিজিওয়া আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল—

“এ সময়ে আমাদের ঝঞ্ঝাটটা তার মা বাপের বোঝা উচিত।

এই রকম ব্যারামি মেয়েকে আমাদের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে চুপ করে থাকেই বা কি করে? ছুনিয়ায় স্বার্থ ছাড়া আর কথা নেই!"

"তাইত দেখছি।"

"কিন্তু সব চেয়ে বেশী ভাবনা হচ্ছে তাকেও-সানের জন্যে। আমরা যা বেশী ভয় করচি তা যদি হয় তা হলে কাওয়াশিমা-পরিবারের দফা রফা! আর তার ত এ অসুখ হলেই হোল। কিন্তু তাদের যখন বিয়ে হয়েচে তখন ত আর তাদের আলাদা রাখতে পার না।"

"ঠিক ঠিক।"

"মা বাপের কাজ হচ্ছে সব সময়ে ছেলেদের ইচ্ছামত কাজ করতে না দেওয়া। তাদের ভালোর জন্যেই মাঝে মাঝে তাদের বেত মারা দরকার। গোড়ায় গোড়ায় হয়ত ছেলে ছোকরারা ভারি বেঁকে বসবে, কিন্তু কিছুদিনের পর মন তাদের আপনিই নরম হয়ে যাবে।"

"তা বটে।"

"সামান্য একটু ভালবাসা বা দয়ার জন্যে তুমি ত আর কাওয়াশিমা-পরিবারের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পার না!"

"নিশ্চয়ই নয়।"

"তারপর সে যদি গর্ভবতী হয় তা হলে—"

"হ্যাঁ, ও কথা ত ভাবিই নি, তুমি ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ।"

তাহার যুক্তিগুলি মাসীমাতার অন্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছে বুঝিয়া চিজিওয়ার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ আলোচ্য বিষয়টি বদলাইয়া ফেলিল। সে তাঁর মনে যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে তাহা ত অচিরাৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে! অধিকন্তু সে দেখিতে পাইয়াছে, যে-বীজ রোপিত হইয়াছে তাহা তখন অপ্রকাশিত থাকিলেও সময়ে তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মাইয়া ফুল ও ফল ধরিবে! সে সময় আসিতে অধিক বিলম্ব নাই!

তাকেওর মাতা নিজে এমন মন্দ লোক ছিলেন না যে কোনো কারণে নামিকে ঘৃণা করিতে পারেন। তিনি বরং শিক্ষা ও মেজাজের এত পার্থক্য সত্ত্বেও শ্বশ্রূর সহিত একমত হইবার চেষ্টার জন্য নামিকে খুব পছন্দ করিতেন। রুচি সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে কখনো তাঁদের মতের মিল হইলে তিনি আনন্দিত হইতেন; এমন কি কখনো প্রকাশ না করিলেও তাঁর হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে এই চিন্তাটি উদিত হইত যে তিনি বাল্যকালে কোন প্রকারে নামির সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু এক মাসের পীড়ার পর যখন তিনি স্বচক্ষে অসাধ্য রোগাক্রান্তা নামিকে দেখিলেন ও যথেষ্ট অর্থব্যয়ের পরও যখন তাহার সত্বর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল,—তাহা নৈরাশ্য বা বিরক্তি ঠিক বোঝা গেল না। চিন্তা আসিয়া সেই ভাবটিকে ক্রমশ পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল ও অবশেষে ঘৃণার প্রবল বন্যায় তাঁহার সকল সংযম ভাসিয়া গেল।

এদিকে চিজিওয়া দক্ষতার সহিত মাসীমাতার মনের অলিগলির মধ্যে প্রবেশ করিল। মধ্যে মধ্যে তাঁর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে স্বমতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাকেওর অনুপস্থিতির সময় মাসীমাতার নিকট চিজিওয়ার ঘন ঘন যাতায়াত যখন কানাঘুষা হইতে আরম্ভ হইল তখন তাহার প্রধান মতলবটি সিদ্ধ হইয়াছে ও ভাবী নাটক রচনার সাফল্যের জন্য য়্যামাকির সহিত সে এক আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাতাপুত্র

তাকেও যে যুদ্ধ-জাহাজে কার্য্য করিতেছিল তাহা মে মাসের প্রথমে দক্ষিণে সাসেবো নামক নৌ-বন্দরে যাইবে, এবং তথা হইতে উত্তরে হাকোদাতের নিকটে সংযুক্ত রণপোতবাহিনীর প্রদর্শনীতে যোগ দান করিবে এইরূপ স্থির ছিল। মাসাধিক কাল সেখানে থাকিতে হইবে, সেই হেতু এক দিন সন্ধ্যায় সে মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিল।

সম্প্রতি তাকেওর সহিত তার মাতার একেবারেই বনিবনাও হইতেছিল না। কাণের মধ্যে মক্ষিকা প্রবেশ করিলে লোকের অবস্থা যেমন হয় তাঁহারও তেমনি হইতেছিল। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তিনি অসাধারণ সন্তোষের সহিত স্বহস্তে তাকেওর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ছোটখাট বিষয় লক্ষ্য না করিলেও মাতার এই অস্বাভাবিক প্রীতি দেখিয়া তাকেও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যত বয়ঃপ্রাপ্ত হউক না কেন, মাতার ভালবাসা পাইলে যে-কোনো ব্যক্তি সুখী হয়। মাতার সম্প্রতিকার রুক্ষ মেজাজের পর এরূপ ব্যবহারে তাকেও বিশেষ করিয়া সুখী হইল। পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া স্নান করিতে করিতে যখন সে বৃষ্টির টুপ টাপ শব্দ শুনিতেছিল তখন তাহার চিন্তা, গৃহে আসিবার পথে জুসিতে যাহা দেখিয়াছে তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া, যখন নামি পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে, সেই সুখের সময় পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। স্নান শেষে তুষ্টচিত্তে একটি ঢিলে পোশাক পরিয়া ডান হাতের তালু দিয়া কপাল ঘসিতে ঘসিতে

তাকেও মাতার কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার দুই আঙুলের মধ্যে একটি জ্বলন্ত চুরুট।

তাকেওর মাতা তখন একটি দীর্ঘ নলে ধুম-পান করিতেছিলেন। পরিচারিকা তাঁর স্কন্ধদেশ টিপিয়া দিতেছিল। মুখ তুলিয়া তিনি কহিলেন, "এরি মধ্যে শেষ হল? তোমায় দেখলে তোমার বাবা যখন স্নান করে বেরুতেন সেই কথাই মনে পড়ে। ঐ খেনে বোস। হয়েছে মাৎসু, এখন গিয়ে চা নিয়ে এস।"

বিধবা উঠিয়া কুলঙ্গি হইতে পিষ্টকের রেকাবখানি পাড়িলেন। "আমাকে যে অতিথের মত অভ্যর্থনা করচ মা!" চুরুট টানিতে টানিতে তাকেও ঈষৎ হাসিল।

"ঠিক সময়েই ফিরেচ তাকে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, দেখা হওয়াটা দরকার হয়েছিল। আসবার সময় তুমি জুসিতে থেমেছিলে?"

সে সদাসর্ব্বদা জুসিতে যায় মাতা তাহা পছন্দ করিতেন না জানিলেও তাকেও তাঁহাকে প্রতারণা করিতে পারেনা। তাই সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ খানিক ক্ষণের জন্যে। সে ভালো হয়ে উঠচে বোধ হল। তোমাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলেচে সেই জন্যে কত দুঃখ করছিল।"

"তাই না কি?"

তিনি খুব মনোযোগের সহিত তাকেওর মুখ নিরীক্ষণ করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে চা'র সরঞ্জাম আসিয়া পৌঁছিল। বৃদ্ধা সেগুলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আপাততঃ তোমাকে দরকার নেই মাৎসু। দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দাও।"

তিনি নিজের ও তাকেওর জন্য চা ঢালিলেন। এক পেয়ালা শেষ করিয়া দীর্ঘ নলটি তুলিয়া ভর্ত্তি করিতে করিতে বলিলেন—

"আমার শরীরের অবস্থা ভারি খারাপ। এই গত বছরের বাতে

তো এক রকম মারা যেতেই বসেছিলুম। কাল তোমার বাবার সমাধি দেখতে গিয়েছিলুম, এখনো হাড়গুলো ব্যথা করচে। মনে হয় যেন এক পা কবরে দিয়েছি। খুব সাবধান বাবা তাকে, অসুখ বিসুখ যেন না হয়!"

আগুনের বাক্সের মধ্যে চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাকেও মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল শরীর খুব মাংসল হইলেও তাঁর কপালে অনেকগুলি রেখা ফুটিয়াছে।

তাকেও কহিল, "আমি প্রায় সব সময়েই বাইরে থাকি, আর তুমি ছাড়া সংসার দেখবারও কেউ নেই! নামি যদি ভাল থেকে তোমায় সাহায্য করতে পারতো! সে-ও সব সময়ে তাই বলে।"

"সে তা ভাবলে কি হবে? আমি বাপু যক্ষ্মাকে বড় ভয় করি!"

"কিন্তু এখন ত সে অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছে! বেশ একটু গরম পড়ে আসচে, তার বয়সও অল্প, সেরে উঠতে পারে।"

"তা হলে কি হয়, আমার কিন্তু মনে হয় না সে শীগ্‌গির সেরে উঠবে! ডাক্তার বলছিলেন যে, তার মাও যক্ষ্মায় মারা গিয়েছিলেন!"

"হ্যাঁ সেও আমাকে তা বলেছে কিন্তু—"

"যক্ষ্মা তো মা বাপের হলে ছেলে পুলেরও হয়, নয় কি?"

"হ্যাঁ তাই শোনা যায় বটে। কিন্তু নামির অসুখ ঠাণ্ডা লেগে হয়েচে। সবই সাবধানতার ওপর নির্ভর করে। লোকে বলে ছোঁয়াচে রোগ—মা বাপের হলে ছেলে পুলের হয় ইত্যাদি; কিন্তু বাস্তবিক অন্য কারণ আছে। তুমি ত জান নামির বাবা কেমন জোয়ান, তারপর নামির বোন কোমাসান—সেও ত যক্ষ্মার কোনো লক্ষণই দেখায় নি। ডাক্তারেরা আমাদের যতটা দুর্ব্বল ভাবে আমরা ততটা নই।"

তাকেও হাসিল।

"হ্যাঁ, কিন্তু এটা হেসে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়।" হাতের উপর ধূমপানের নলটি ঠুকিয়া পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার মনে হয় এমন ভয়ানক রোগ আর নেই। তোগো-পরিবারের কথা জানত তুমি। ওদের যে ছেলেটির সঙ্গে তুমি ঝগড়া করতে তার মা দু' বছর হল যক্ষ্মায় মারা গেছে। আর তোগোসান নিজে সেই রোগে ছ' মাস হল মারা গেছে। জান ত? তার পরে তার ছেলে—ঐ যে কোথাকার ইঞ্জিনিয়ার ছিল—শুনলুম সেও না কি সম্প্রতি ঠিক ঐ রোগে মারা গেছে। এক জনের থেকে ত তাদের সবাইয়ের হোল? এ রকম ঘটনা আমি তোমায় আরো বলতে পারি। আমাদের খুব সাবধান হতে হবে, নইলে ভয়ানক কাণ্ড হবে বলে রাখচি।" নলটি রাখিয়া দিয়া বিধবা সম্মুখে ঝুঁকিলেন। তাকেও নীরবে শুনিতেছিল, আড়চোখে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন—"তোমায় কিছু বলতে চাই"—একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাকেওর উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। "আমি, বুঝেচ—"

"কি?" বলিয়া তাকেও মুখ তুলিল।

"নামিকে যদি ডাকিয়ে পাঠানো যায় ত কেমন হয়?"

"ডাকিয়ে পাঠানো? সে আবার কি?"

বিধবা তাকেওর মুখ হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া কহিলেন, "এই তাকে তার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া যায়!"

"বাপের বাড়ী? সেখানে তার শুশ্রূষা হোক এই তুমি চাও?"

"হ্যাঁ, শুশ্রূষা হতে পারে। সে যাই হোক তুমি তাকে পাঠিয়ে দাও।"

"কিন্তু তার পক্ষে জুসিই সব চেয়ে ভালো জায়গা। কাতাওকা-দের বাড়ীতে ছেলেপুলে রয়েছে—আর তার তোকিওতে ফেরাই যদি তোমার ইচ্ছে হয় ত তার এখানে থাকাই সব চেয়ে ভালো।"

চা জুড়াইয়া গিয়াছিল। তাহা পান করিয়া বিধবা কহিলেন—তাঁহার স্বর কাঁপিতেছিল—"তাকেও তুমি মাতাল হওনি বোধ হয়! আমার কথা না বোঝবার ছল করচ কেন?" তাকেওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "আমি বলছিলুম—নামিকে তার বাপের বাড়ীতে ফেরত পাঠাও।"

"ফেরত? ফেরত পাঠাব? তুমি বলছো তাকে ত্যাগ করতে?"

"আস্তে! বড় চেঁচিয়ে কথা কইচ তাকে!" কম্পিত পুত্রের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "ত্যাগ—হ্যাঁ তাই বটে।"

"ত্যাগ! ত্যাগ! কেন?"

"কেন জিজ্ঞেস করচ? আগেই ত বল্লুম, তার ঐ ভয়ানক রোগের জন্যে।"

"যক্ষ্মা হয়েছে বলে তুমি নামিকে ত্যাগ করতে বলছ?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই—কি করব বল।"

"ত্যাগ!"

তাকেওর হাত হইতে চুরুটটি আগুনের মধ্যে খসিয়া পড়িয়া প্রচুর ধূমোদ্গীরণ করিতে লাগিল, হিস্ হিস্ শব্দে দীপ জ্বলিয়া উঠিল, নিশীথ বৃষ্টি বাতায়নে ঝাপট মারিতে লাগিল।

ধূমায়মান চুরুটটি ছাইএর মধ্যে প্রোথিত করিয়া বিধবা বলিতে লাগিলেন—

"এ কথা শুনে যে তুমি অবাক হয়ে গেছ তা'তে তোমায় দোষ দিই না। কথাটা তোমার কাছে খুব আকস্মিক, আমি কিন্তু অনেক দিন ধরে ভেবেছি—এই কথা মনে রেখে শুনতে হবে। আমি যতদূর জানি তা'তে নামির এমন কোন দোষ নেই যাতে আমি বিশেষ করে অসন্তুষ্ট হতে পারি, আর তুমিও তাকে পছন্দ কর।

সেই জন্যে এমন কথা বলতে আমি মোটে পছন্দ করি না; কিন্তু যাই বলি আর যাই কই রোগটা যে ভয়ানক তাতে—"

তাকেও বাধা দিয়া কহিল, "আরে সেরে ত উঠছে সে।" মাতার দিকে সে স্পর্দ্ধিত ভাবে চাহিল।

"আমি যা বলছি শোন। এখন তার অবস্থা তত খারাপ না হতে পারে কিন্তু ডাক্তার বলেছে এখন ভালো দেখালেও ব্যারাম শীগ্‌গিরই খারাপ হয়ে দাঁড়াবে, বায়ুর অবস্থার একটু বদল হলেই এরূপ ঘটবে। যক্ষার ব্যারাম কারুরই একেবারে সারে না—ডাক্তারও তাই বলে। নামি এখন খুব পীড়িত না হলেও এর পরে নিশ্চয়ই অবস্থা খারাপ হবে আর তোমাকেও ঐ রোগে ধরবে। তোমার ছেলেপুলে হতে পারে তাদেরও ঐ রোগ হবে। মনে কর সেই ব্যারামে কেবল নামি নয় বাড়ীর মালিক তুমি ও তোমার উত্তরাধিকারী সকলেই মারা গেলে! কাওয়াশিমা-পরিবার একেবারে লোপ পেল! তোমার বাপ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মিকাদোর বিশেষ অনুগ্রহে যে উন্নতি করেছিলেন—যে-পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক পুরুষ যেতে না যেতেই তার সব শেষ হয়ে যাবে! নামির সঙ্গে খুব সহানুভূতি করা উচিত, তুমি তার জন্যে খুব দুঃখিত, আমি শাশুড়ী হয়ে এমন কথা বলতে একেবারেই অনিচ্ছুক—এ সবই সত্য, কিন্তু ভেবে দেখ তার ব্যামোটা কি। যতই কেন দুঃখ কর না সে ত আর বাড়ীর মালিক তুমি বা কাওয়াশিমা-পরিবারের সমান নয়। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে কথাটা বুঝে কর্ত্তব্য একেবারে ঠিক করে ফেল।"

তাকেও নীরবে শুনিতেছিল। প্রাতঃকালে যাহার নিকট গিয়াছিল সেই পীড়িতা পত্নীর মুখ তার মনের মাঝে দিনের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

সে কহিল, "আমার দ্বারা এ কাজ হবেনা মা!"

"কেন?"—তাঁহার স্বর কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল।

"এখন এরকম করলে নামি মারা যাবে।"

"তা যদি যায় ত যাক! তোমার জন্যে, কাওয়াশিমা-পরিবারের জন্যে আমার ভাবনা বেশী।"

"আমার জন্যে যদি ভাবো তা হলে আমি যেমন ভাবি তেমনি ভাবো। তোমার হয়ত আশ্চর্য্য বোধ হবে কিন্তু আমি কোনোমতে এ কাজ করতে পারি না। সে ছেলেমানুষ, সেই জন্যে তোমায় সাহায্য করতে পারে না, কিন্তু সে তোমায় আর আমায় দুজনকেই ভালোবাসে। এমন নিরীহ স্ত্রীকে কেবল তার অসুখের জন্যে কেমন করে ত্যাগ করি? যক্ষ্মা সারানো যায় না এমন কোনো কথা থাকতে পারে না। আর সে ত সেরে উঠচে। আর সে যদি মরেই তাহলে মা তাকে আমার স্ত্রী থেকে মরতে দাও। এ রোগে যদি বিপদ থাকে ত আমি তার কাছে যাব না, খুব সাবধান হব, তুমি যা বলবে তাই কর্‌ব; কিন্তু তাকে ত্যাগ করা—প্রাণ থাকতে তা পারব না।"

"হ্যাঁ! তুমি কেবল নামির কথা বল্‌ছ কিন্তু নিজের কথা বা কাওয়াশিমা-পরিবারের কথা ভাব না।"

"তুমি আমার প্রাণ বাঁচানোর কথাই কেবল বল্‌চ কিন্তু নিষ্ঠুর অন্যায় উপায়ে বেঁচে থেকে কি লাভ? নিষ্ঠুর অন্যায় কাজ করলে কোনো বংশের মান বাড়ে না। আমি তাকে ত্যাগ করতে পারি না—কিছুতেই না!"

কোনো-না-কোনো প্রকার বাধার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও তাকেওর একগুঁয়েমি দেখিয়া বিধবা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁর উত্তেজনক্ষম মেজাজ সহজেই ভয়ানক রুক্ষ হইয়া উঠিল। কপালের শিরা স্ফীত

হইয়া উঠিল, রগ দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। যে হাতে ধূমপানের নল ধরিয়াছিলেন সে হাতটিও কাঁপিতেছিল। ক্রোধ সংবরণ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমন কি একটু হাসিবার চেষ্টাও করিলেন।

"আ—হা! রেগো না। স্থির হয়ে ভেবে দেখ। তুমি এখনো ছেলেমানুষ কি না তাই সংসারের বিষয় কিছু জান না। জান ত কথায় আছে—ছোট জীবকে মেরেও বড় জীবকে বাঁচাও। নামি হচ্ছে ছোট জীব; আর তুমি ও কাওয়াশিমা-পরিবার—হলে বড় জীব। নামির জন্যে, তার মা বাপের জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু রোগে পড়াটা কি ভাল? তারা আমাদের বিষয় যাই ভাবুক, কাওয়াশিমা-বংশ কোনোমতে লোপ হতে দেওয়া নয়! তুমি অন্যায় কাজের কথা বল্‌চ, নিষ্ঠুরতার কথা বল্‌চ কিন্তু এরকম ব্যাপার সব জায়গাতেই ঘটচে। স্ত্রী যখন পরিবারের সম্মান বাড়ায় না তখন তাকে ত্যাগ করাই উচিত; তার গর্ভে সন্তান না জন্মালেও তাকে ত্যাগ করা উচিত—এইত হোল নিয়ম, তা কি তুমি জান না? বিচার বা দয়ার কথা তোলবার দরকার নেই। এরকম সময়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তার মা বাপেরই আসা উচিত ছিল। তা যখন তারা আপনা হতে করবে না, তখন কি করা উচিত সে কথা তাদের বলতে দোষ কি?"

"তুমি কেবল 'উচিত' 'উচিত' বল্‌ছ। কিন্তু অন্যে অন্যায় করে বলে আমাদেরও অন্যায় করবার কোনো অধিকার নেই। রোগের জন্যে ত্যাগ করা—সে পুরাকালের কথা, এখনো যদি সে নিয়ম থাকে ত তা ভাঙ্গা দরকার, দরকার কেন, আমরা সে নিয়ম ভেঙ্গে দেব। তুমি ভাবচ আমাদের পরিবারের কথা, কিন্তু নামির পরিবার কি ভাববে, যখন যে-মেয়ের সেদিন বিয়ে হয়েছে তাকে কেবল

রোগের জন্যে ত্যাগ করা হবে? আর নামি—সেও কি ফিরে যেতে অপমান বোধ করবে না? মনে কর আমারই যদি যক্ষ্মা হত, আর ব্যারামটা সংক্রামক বলে' তারা নামিকে ফেরত নিতে আসত! তুমি কি তা পছন্দ করতে? কিন্তু কথা একই!"

"না, সে কথা আলাদা। মেয়েমানুষ পুরুষের সমান নয়।"

"সমান নয়ত কি, নিশ্চয়ই সমান! অন্তত অনুভব করবার শক্তি দু'জনেরই সমান। কাজের কথা ধরলেও নামি সম্প্রতি ভালো আছে। উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এখন যদি তুমি এমন কর আবার ব্যারাম বেড়ে যাবে। সে মারা যাবে—নিশ্চয়ই মারা পড়বে। যাকে জানি না তার প্রতিও এমন ব্যাভার করতে পারি না। নামিকে কি মারতে বল আমাকে?"

তাকেও কাঁদিতে লাগিল।

তাকেওর মাতা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাড়ীর পবিত্র কুলঙ্গি হইতে একখানি "ইহাই" * পাড়িয়া তাকেওর সম্মুখে স্থাপন করিয়া কহিলেন—

"শোন তাকেও! আমার কথা তুমি তাচ্ছিল্য করূচ, কিন্তু তোমার বাবার সামনে বল ত যা বলছিলে। বল তোমার পূর্ব্বপুরুষদের আত্মা তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে! বল আবার! অবাধ্য ছেলে!" তাকেওর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তিনি আগুনের বাক্সের কানায় ধূমপানের নলটি বার বার ঠুকিতে লাগিলেন। স্বভাবত মাতার প্রতি বিনয়ী হইলেও তাকেওর মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—

"অবাধ্য হলুম কেমন করে?"

"কেমন করে? কেন তুমি জিজ্ঞেস করূচ? স্ত্রীর জন্যে মার

* বুদ্ধ-নামাঙ্কিত কাষ্ঠফলক। মৃত ব্যক্তির আত্মার স্থলাভিষিক্ত।

কথা অমান্য করা অবাধ্যতা নয়? যে তোমাকে লালনপালন করেচে তার কথা একটু না ভেবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ব্বপুরুষের বংশ উচ্ছন্ন দেওয়া অবাধ্যতা নয়? তুমি অবাধ্য ছেলে, পুত্রের কর্ত্তব্য তুমি কর না!"

"কিন্তু মনুষ্যত্ব—"

"রাখো তোমার ও কথা! তুমি কি তোমার স্ত্রীকে মা বাপের চেয়ে বেশী মনে কর? মুখ্যু কোথাকার! কেবল স্ত্রী স্ত্রী—মা বাপের কথা কি কখনো ভাবো? কুলাঙ্গারের মুখে নামি ছাড়া আর কথা নেই! আমরা তোমাকে ত্যাগ করব।" তাকেও অধর দংশন করিল, চক্ষু তাহার জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

"তুমি ত বড় নিষ্ঠুর মা!"

"নিষ্ঠুর কেন?"

"তোমার প্রতি এমন মনের ভাব আমার কখনো হয় নি। কিন্তু তুমি আমার মন বোঝ কই?"

"তাহ'লে কেন আমার কথা-মত নামিকে ত্যাগ কর না।"

"কিন্তু—"

"না, 'কিন্তু' নেই। দেখ তাকেও, তুমি হয় তোমার স্ত্রীকে না হয় তোমার মাকে ভালোবাস। কি? নামি তোমার কাছে বেশী হল? মুখ্যু!"

রাগতভাবে তিনি ধূমপানের নল দিয়া আগুনের বাক্সের উপর সজোরে আঘাত করিলেন, নলটি টুকরা টুকরা হইয়া গেল ও নলের মাথাটি ঠিকরাইয়া পর্দ্দার উপর গিয়া পড়িল।

এই সময় পর্দ্দার অপর দিকে কে যেন অর্দ্ধোচ্চারিত বিস্ময়-ধ্বনি চাপা দিতেছে শুনা গেল। তারপর কম্পিত কণ্ঠে কে বলিল, "ও—শুনচেন।"

"কে ? কি চাও ?"

"এই একখানা টেলিগ্রাম।"

পর্দ্দা টানিয়া তাকেওর টেলিগ্রাম দর্শন ও বিধবার ভীষণ দৃষ্টি দেখিয়া ত্রস্ত পরিচারিকার অন্তর্দ্ধান—এই দুই ঘটনার মধ্যে মাত্র দুই মিনিটের ব্যবধান ছিল। কিন্তু এই অত্যল্প কালের মধ্যে তাহাদের ক্রোধের কতকটা উপশম হইয়াছিল। মাতাপুত্র নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

বাহিরে বৃষ্টি নামিল ঝম্ ঝম্ ঝম্!

অবশেষে বিধবার মুখ ফুটিল। তাঁহার চক্ষু দিয়া তখনো ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, কিন্তু কথা কথঞ্চিত কোমল ভাব ধারণ করিয়াছে।

"তাকে, আমি তোমার মন্দ করবার জন্যে এমন কথা বলছি না। তুমি আমার এক ছেলে। সংসারে তুমি উন্নতি কর, আর একটি নাদুস নুদুস নাতির মুখ দেখি, এই আমার একমাত্র ইচ্ছে।"

তাকেও গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। অবসন্নভাবে মাথা তুলিয়া টেলিগ্রামখানি দেখাইয়া কহিল, "আমাকে এখনি যেতে হবে, হুকুম এসেচে। খুব দেরি করলেও কালকে যাত্রা করতেই হবে। ফিরতে প্রায় মাস খানেক হবে। ফেরা পর্য্যন্ত যেন কখনো এ কথার উল্লেখ কোরো না।"

পরদিন আর একবার মাতার আশ্বাস-বাণী শুনিয়া ও গৃহ-চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নামির উপযুক্ত শুশ্রূষার জন্ত তাহাকে অনুরোধ করিয়া বৈকালের গাড়িতে তাকেও জুসি যাত্রা করিল।

জুসিতে যখন সে অবতরণ করিল সূর্য্য তখন অস্তাচলে নামিয়াছে। ঈষন্নীল পাণ্ডুরবর্ণ আকাশে কাস্তের মত চাঁদ ঝুলিতেছিল। ক্ষুদ্র নদীর

উপরকার পুল পার হইয়া সে একটি রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তাটি অন্ধকারময়, দেবদারু-কুঞ্জের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গেছে। কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া দেখিল কূপ হইতে জল তুলিবার দণ্ডটি সন্ধ্যাকাশের গায়ে যেন কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এমন সময় সহসা তাহার কানে অপ্রত্যাশিত বীণা-ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

সে ভাবিল, সে-ই বাজাইতেছে! বোধ হইল যেন বুক ভাঙিয়া যাইবে, তাই সে ক্ষণকাল ফটকের নিকটে দাঁড়াইয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। নামি সেদিন বিশেষ সুস্থ ছিল, পতির জন্য হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল তাহাই সে বীণার তারে ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল!

নামি মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিল যে, তাকেওর মনের মধ্যে কিছু একটা রহিয়াছে। নামির প্রশ্নের নির্দ্দিষ্ট কোনো উত্তর না দিয়া তাকেও কেবল কহিল গত রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল। তাকেও আসিবে বলিয়া সেদিন বিশেষ রকম আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছিল। পতি পত্নী উভয়ে আহার করিতে বসিল, কিন্তু কেহই কিছু খাইতে পারিল না। ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ পাছে প্রকাশ পায় সেই ভয়ে নামি অধরের কোণে একটু নিরানন্দ হাস্য জাগাইয়া পতির কোটে বোতাম আঁটিতে ও তাঁহার পোশাকগুলি সযত্নে ঝাড়িতে ব্যাপৃত হইল। ক্রমে শেষ ট্রেনের সময় নিকটবর্ত্তী হইল। যখন আর থাকা সম্ভব নয় তখন তাকেও যাইবার জন্য উঠিল। তাহার বাহু ধরিয়া ঝুলিয়া নামি কহিল, "সত্যিই তুমি চল্লে?"

"শীগ্‌গিরই ফিরব। সাবধানে থেকে সেরে ওঠ।"

উভয়ের হস্ত দৃঢ়বদ্ধ। দ্বারের নিকট বৃদ্ধা ইকু জুতা আগাইয়া দিল, ভৃত্য মোহেই প্রভুর সহিত ষ্টেসনে যাইবার জন্য বাম হাতে একটি ক্ষুদ্র থলি ও ডান হাতে লণ্ঠন লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

"তাহলে ইকু তোমার জিম্মেয় নামিকে রেখে যাচ্ছি। নামি-সান চল্লুম।"

"শীগ্‌গির ফিরো!"

মাথা নাড়িয়া তাকেও সম্মতি জ্ঞাপন করিল। লণ্ঠনের আলোকে দশ বার পদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দেখিল। শাদা শাল গায়ে দিয়া ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া নামি রুমাল নাড়িতেছিল।

"শীগ্‌গির ফিরে এসো!"

"হ্যাঁ আসবো! বাইরে ঠাণ্ডা লাগবে। ভেতরে যাও নামি-সান।" কিন্তু যখন সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ফিরিয়া চাহিল তখনো দেখিল একটি অস্পষ্ট শ্বেত মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। তারপর পথটা বেঁকিল, আর সে মূর্ত্তি দেখা গেল না। কেবল আর একবার শুনা গেল সেই অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা—"শীগ্‌গির ফিরে এসো!"

নিম্নে বহুনিম্নে চক্রবালের নিকটে দ্রুত-নিমজ্জমান ক্ষীণ চন্দ্র তখন দেবদারু-কুঞ্জের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাবী বধূ

স্নান সমাপনান্তে য়্যামাকি একখানি নরম আসনের উপর বেশ স্বচ্ছন্দে বসিয়া ছিল। এখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, হাতে কোনো কাজ নাই। তাহার পশ্চাতে একটি ফুলদানিতে এক গুচ্ছ আইরিশ পুষ্প ও সম্মুখে আহার্য্য সজ্জিত। প্রথমেই সে কিঞ্চিৎ সাকে পান করিল। পত্নী ওস্থমি পরিবেশনার্থ বসিয়া ছিল, তাহার দিকে সে দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টিতে অসন্তোষ ছিল না। য়্যামাকি পত্নীর সাধাসিধা চেহারাটি লক্ষ্য করিতেছিল।

পরিচারিকা সন্ধ্যার সংবাদপত্র লইয়া আসিল। সংবাদপত্রে চোখ বুলাইতে বুলাইতে য়্যামাকি বলিতে লাগিল, "এই যে কোরিয়া সম্বন্ধে —গোলমাল বাড়চে, বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাচ্চে—কি? চীন সৈন্য পাঠাচ্ছে? বেশ তাহলে জাপানও সৈন্য পাঠাতে ছাড়বে না। লড়াই বাধবে। টাকা উপায়ের একটা ভারি সুযোগ হবে। ওসুমি এস তুমিও এক পাত্তর খাও, খবর ভাল।"

"সত্যি? লড়াই হবে না কি?"

"হ্যাঁ। খুব মজা! আর একটা ভালো খবর আছে। আজ চিজিওয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বল্লে বিষয়টা বেশ অগ্রসর হচ্ছে।"

"তাই না কি? তাকেও-সান মত দিয়েচে?"

"আরে না না। সে ত এখনো ফেরেনি, তার মত পাবে কেমন করে? তবে ওনামি-সানের আবার রক্ত বমি হয়েছিল। তার শাশুড়ী সব আশা ত্যাগ করেচে, বলেছে তাকেওর অনুপস্থিতিতেই তার মতলব হাসিল করবে! দেখে নিও এ ঠিক হবে, চিজিওয়া যদি অনবরত তার কানে মন্তর দিতে থাকে। তাকেও বাড়ী থাকলে এ কাজটি করা একেবারেই সহজ হবে না, তাই বিধবা তার অবর্ত্তমানে কাজ সারতে চায় আর কি! তারপর আমাদের সব সুবিধে হয়ে যাবে। নাও, পেয়ালা ভর্ত্তি কর।"

"আহা বেচারা ওনামি-সান!"

"তুমি ত মজার মেয়েমানুষ দেখচি! ওনামি-সানকে সরাতে চেয়েছিলে বেচারা ওতোয়োর দুঃখ দেখে; আর এখন, যখন সেই ইচ্ছেটা পূর্ণ হতে চলেছে তোমার কিনা দুঃখ হল নামিসানের জন্যে। ও-সব ছেলেমানুষি ছেড়ে কি করে' ওতোয়োকে নামির গদিতে বসাবে তাই ভাবো।"

"তাকেও-সান যদি দেখে তার অনুপস্থিতিতে নামিকে ত্যাগ করা হয়েছে তা হলে নিশ্চয়ই খুব রাগ করবে।"

"তা রাগ করুক আর যাই করুক, একবার ঠিক হয়ে গেলে আর কিছুতেই কিছু হবে না। আর তাকেও-সান সুবোধ ছেলে, মা একটু কান্নাকাটি করলেই চুপ করে যাবে! সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যাক এ সব ত বেশ হল। এখন আসল কথা যা —আমাদের ওতোয়ো সুন্দরী। তাকেওর রাগটা খানিক পড়ে এলে তোয়োকে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, তা সে ডাকুক আর নাই ডাকুক। বলা যাবে—সহবৎ শিখতে গেছে। খাবার খরচ ও আর আর যা লাগে তা নিশ্চয়ই আমরা দেব। প্রথমে যতটা শক্ত ভাবা গিছল আসলে ততটা নয়। সবই তাকেওর মায়ের মর্জ্জি। ওতোয়ো যদি ব্যারনেস কাওয়াশিমা হয়, তাহলে তার ইচ্ছে পূর্ণ হবে। আর আমি তাকেওর শ্বশুর হব, আমি কাওয়াশিমা পরিবারের জমিদারি দেখব, তাকেও একটা নিতান্ত ছেলেমানুষ বৈ ত না! তোফা! কেয়া মজা! কিন্তু গণ্ডগোলও হবে। তা হোক গণ্ডগোল। আপাতত আমাদের ভাববার বিষয় হচ্ছে ওতোয়ো।"

"কি তুমি খাবেনা না কি?"

"রেখে দাও খাওয়া! খাওয়ার জন্যে কে ভাবে এমন ফূর্ত্তির সময়! আচ্ছা বেরসিক ত! তুমি কিন্তু ওতোয়োর দিকে একটু নজর রেখ। স্বভাবটা যেন সে সোধরায়। না হলে সব মাটি করবে। চব্বিশ ঘণ্টা ও রকম খিটখিট করলে এমন শাশুড়ী নেই যে চটবে না, হোক না কেন সে দয়ার অবতার!"

"আমি কিন্তু নিজে তাকে শেখাতে পারব না। তুমি সব সময়ে খালি—"

"থাম থাম! ও রকম ওজর আমার ভাল লাগে না। কথায়

চেয়ে কাজ ভালো। কেমন করে শেখাতে হয় দেখাচ্ছি। ডাক ত ওতোয়োকে।"

***

"দিদিমণি, কর্ত্তাবাবু তোমায় ডাকছেন।"

সেইমাত্র তোয়ো তার সায়ংকালীন সাজসজ্জা শেষ করিয়াছে, কিন্তু আয়নার সম্মুখ হইতে তখনো বিদায় গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরিচারিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইল।

"আচ্ছা, এই হোল বলে'।" চুলে হাত দিয়া বলিল, "আচ্ছা দেখ্ এখানটা একটু খারাপ হয়ে গেছে, না ?"

"কিছু খারাপ হয় নি। তোমায় কি খাসা দেখাচ্ছে দিদিমণি !"

"সত্যি না কি ?" আয়নার দিকে চাহিয়া তোয়ো মৃদু হাস্য করিল।

মুখের উপর হইতে আস্তিন সরাইয়া হাস্য সংবরণ করিয়া পরিচারিকা কহিল, "কর্ত্তাবাবু বসে রয়েছেন তোমার জন্যে।"

"জানি গো জানি। যাচ্ছি।"

দর্পনের দিকে শেষ বার দৃষ্টিপাত করিয়া ত্বরিতগতিতে কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া সে পিতার নিকট আসিয়া হাজির হইল।

"এই যে ওতোয়ো, তোমার জন্যে আমরা বসে ছিলুম। তোমার মায়ের কাজটা তুমিই কর, পেয়ালা ভর্ত্তি কর। আহা, বোতলটা কি অমনি জোরে নাবিয়ে রাখতে হয় ? চা পরিবেশনের শিক্ষাটা তবে কি রকম হয়েচে ? হ্যাঁ এই বার ঠিক হয়েছে, অমনি আস্তে আস্তে করতে হয়।"

য়্যামাকি "চুর" হইয়া উঠিয়াছিল। পত্নীর নিষেধ স্বত্বেও সে পুনর্ব্বার পান করিয়া কহিতে লাগিল, "এই রকম সাজগোজ করলে ওতোয়োকে দিব্যি দেখায়, কি বল ওসুমি ? রংটাও ওর ফর্শা।"

তোয়ো হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। আনন্দ আর ধরে না।

"সময়বিশেষে ওর চেহারাও সুশ্রী, কথাও মিষ্টি। কেবল ওর সামনের দাঁতটা ওর মারই মত একটু উঁচু এই যা।"

"দেখ!" বলিয়া ওসুমি ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া তিক্তের আস্বাদ পাইলে যেমন হয় ওতোয়োর ঠিক সেইরূপ বোধ হইল। মুখে তাহার তিক্তমধুর ভাব ফুটিয়া উঠিল।

"চোখের কোণ দুটো সামান্য একটুখানি তোলো, আরো ভালো দেখাবে।"

"আবার!" স্বামীর মুখে একটা দরজা লাগান থাকিলে ওসুমি নিশ্চয়ই তাহাতে কুলুপ লাগাইয়া দিত।

"ওই ত! চট কেন ওতোয়ো? ওতে যে চেহারা মাটি হয়ে যাবে। অত রাগে দরকার নেই। শোন, ভালো খবর আছে। আর এক বার পেয়ালা ভর্ত্তি করে দাও, তারপর বলছি।"

পরিপূর্ণ পেয়ালা নিঃশেষে পান করিয়া য়্যামাকি সহাস্যে কহিতে লাগিল—"এইমাত্র আমরা তাকেও-সানের কথা কইছিলুম।"

শূন্য গামলার ধারে বহু নিরানন্দ দিন কাটাইয়া অবশেষে বসন্তের নবীন তৃণগন্ধে অশ্ব যেমন করে, তোয়োও তেমনি মাথা তুলিয়া কান খাড়া করিল।

"তুমি নামি-সানের ছবির ওপর আঁচড় কেটেছিলে, সেই শাপ তাকে লেগেছে।"

"ফের্!" ওসুমি ঠাকরুণ তৃতীয় বার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

"এখন কাজের কথা শোন। ওনামি-সানের খুব অসুখ। সেই জন্যে তাকে ত্যাগ করা হবে। না, তার মা বাপের কাছে কথাটা এখনো উত্থাপন করা হয় নি, ওনামি-সান নিজেও কিছুই জানে না, তবে শীগ্গিরই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তার স্থানে দেওয়া যায়

কা'কে ? এখন কথা হচ্ছে এই,—তোমার মার ও আমার ইচ্ছে তুমিই সে স্থান অধিকার কর। না না, তা বলে এত শীগ্‌গির হতে পারে না! সেই জন্যে তোমায় কাওয়াশিমার বাড়ীতে চাকরি করতে পাঠাব—দাঁড়াও, অত অবাক হলে চলবে না—তরিবৎ শেখবার ছল করে ঢুকবে, কি উদ্দেশ্য সে ত তোমার জানাই রইল। গিন্নির সন্তুষ্টির ওপর তোমার সফলতা নির্ভর করছে। এইটি মনে রেখো।"

নিশ্বাস ফেলিবার জন্য য্যামাকি থামিল। পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কন্যার মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

"কথা এই, ওতোয়ো। সকাল সকাল হলেও কথাটা তোমায় বেশ করে বোঝাতে চাই। তুমি ত জান তাকেও-সানের মা স্বার্থপর একগুঁয়ে খিটখিটে মেজাজের লোক—কিছু মনে কোরো না, তিনি যে তোমার ভবিষ্যৎ মা সে কথা ভুলে যাচ্ছিলুম; কিন্তু যাই হোক, তিনি, এই যে তোমার মা বসে আছেন, এঁর মত ভালমানুষ নন। কিন্তু তা বলে তিনি সাপও নন রাক্ষসীও নন, তিনি মানুষ। বুদ্ধি যদি থাকে ত এমন কি সাপ বা রাক্ষসকেও বিয়ে করা যায়! আমি যদি মেয়েমানুষ হতুম ত তাকেওর মা বা তাঁরই মত আর কাউকে দুদিনে একেবারে জল করে দিতুম। যাক, আমার গুমরে ত আর তোমার কিছু হবে না, কিন্তু কি রকম কর্ত্তে হবে সে বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি। যা বলি বেশ মন দিয়ে শোন ওতোয়ো। যদি তুমি ওখানে চাকরাণী হয়ে যাও—তার মানে বউ হবার চেষ্টায় ছদ্মবেশ ধরে যাও, ত এখানকার মত অত কুড়ে হলে চলবে না। ভোরে উঠতে হবে—বুড়ো মানুষেরা সকাল সকাল ওঠে জান ত—অন্য কাজে মন না দিলেও বুড়ীর কাজ বেশ মন দিয়ে কর্ত্তে হবে। আর দ্বিতীয়ত, আজকাল যেমন সহজেই রেগে ওঠ অমনটি কিছুতেই চলবে না—সব সময়েই হার মানতে হবে। বুঝেচ ?

"বকুনি খাবার সময় চুপটি করে থাকবে, কোনো অসঙ্গত দাবি হলেও 'না' বলবে না। এমন কি তুমি যখন বুঝ্‌চ তোমার কথাই ঠিক তখনো তার উল্টোটাই মেনে নিতে হবে। তবেই তারা কতক কতক তোমার কথা শুনবে। হেরে জেতা বলে' যে একটা কথা আছে তা এই। কথ্‌খনো চটবে না, বুঝলে? শেষ কথা,—যদিও একথা বলবার সময় এখনো হয়নি তবুও এই সুযোগে বলে ফেলি—ধর অবশেষে তোমার বিয়ে হল। সাবধান, তাকেওসানের সঙ্গে যেন সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কোরো না!

"ভিতরে যাই কর প্রকাশ্যে খুব সাবধানে তার সঙ্গে ব্যাভার করবে। শাশুড়ীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা রাখবে, আর তার সামনে স্বামীকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দেবার সাহস থাকা চাই। বৌ ছেলেকে ভালোবাসে দেখে মা'র আনন্দ হওয়া উচিত, কিন্তু প্রায়ই হয় তার বিপরীত—মা তা পছন্দ করে না। কারণ হয় হিংসে, নয় স্বার্থ-পরতা। কিন্তু সে-কথা ছেড়ে দিলেও, স্বামীকে খুব বেশী ভালো-বাসলে শাশুড়ীর অযত্ন হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অন্তত শাশুড়ী তাই ভাবে। ওনামি-সান তাকেও-সানের সঙ্গে সুখী হয়ে ঐ রকম একটা মস্ত ভুল করে থাকবে। ওকি? অত হিংসে কেন? তোমাকে ত বল্লুম এ সব সইতে হবে। শাশুড়ী যাতে বোঝে যে তুমি তার বউ, তার ছেলের বড় বেশী কেউ নও। তরুণ দম্পতি খুব সুখে রয়েছে দেখলে ছেলের মা ভাবে সে একলা পড়ে গেছে—সাধারণত এই কারণে শাশুড়ী-বৌতে বনিবনাও হয় না। তাই বলছি তুমি ভাববে তুমি যেন বুড়ীর স্ত্রী! সময়ে যখন সে 'পটল তুলবে' তখন তুমি তাকেও-সানের গলা জড়িয়ে যতখুসি বেড়িয়ে বেড়াতে পার। কিন্তু গিন্নির সামনে তার দিকে ফিরে একটু হাসতেও পাবে না। আরো উপদেশ আছে, কিন্তু যত দিন না তুমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হও তত দিন

সে সব বল্‌ব না। আপাতত এই তিন বিষয়ই যথেষ্ট। তুমি যখন তোমার প্রিয়তম তাকেও-সানের স্ত্রী হতে চলেছ তখন তোমায় স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। এখন থেকে আরম্ভ করে' তোমার যথাসাধ্য কর।"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পর্দ্দা খুলিয়া একখানি চিঠি লইয়া পরিচারিকা প্রবেশ করিল। লেফাফা ছিঁড়িয়া য়্যামাকি একবার চিঠিখানির উপর চোখ বুলাইয়া লইল, তারপর পত্নী ও কন্যার মুখের সামনে সেখানি ধরিয়া বলিল, "এই দেখ, বল্‌তে বল্‌তে। কাওয়াশিমা-গিন্নি আমার সঙ্গে এখুনি দেখা করতে চান।"

তাকেওর নৌ-প্রদর্শনীতে যাইবার দুই সপ্তাহ পরে এবং কাওয়া-শিমা-গৃহে য়্যামাকির আহূত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে নামির আর এক বার রক্ত বমন হওয়াতে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হইল। সৌভাগ্যক্রমে গুরুতর কিছু ঘটে নাই। আপাতত কোনো আশঙ্কা নাই, চিকিৎসক এইরূপ মত দিলেন। কিন্তু এ সংবাদে তাকেওর মাতা বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দু' এক দিন পরে, বিধবা কাওয়াশিমার যে বিপুল বপু ফটকের বাহিরে কদাচ দেখা যাইত, দেখা গেল সেই বপু লইয়া তিনি ঈদামাচির কাতোদের বাড়ীর দিকে চলিয়াছেন।

যেদিন সন্ধ্যাকালে মাতাপুত্রে নামিকে ত্যাগ করিবার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছিল, সেদিন পুত্রের অপ্রত্যাশিত বাধা প্রাপ্ত হইয়া বিধবা তাহার প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত এ বিষয়ের মীমাংসা স্থগিত রাখিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—কিন্তু ফিরিবার পরেও পুত্র রাজি হইবে কি না সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। তিনি ভাবিতেন যতই দিন যাইবে নামির প্রতি পুত্রের অনুরাগ হ্রাস না পাইয়া ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, তারপর কখন কি ঘটে তাও ত বলা যায় না।

তাই তিনি স্থির করিলেন পুত্রের অবর্ত্তমানে সব স্থির করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু কেমনধারা একটা ভয় এবং পুত্রের নিকট নিজের প্রতিজ্ঞা, চিজিওয়ার সন্তোষজনক কোনো কার্য্য হইতে এতদিন তাঁহাকে বিরত রাখিয়াছিল। নামির দ্বিতীয়বার রক্তবমনের সংবাদ কিন্তু সমস্ত উল্টাইয়া দিল। পুত্রের বিবাহে যিনি ঘটকালি করিয়াছিলেন সেই কাতোর সঙ্গে গিন্নি সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রতিবেশী হইলেও গিন্নি কখনো কাতোদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না। একবার কেবল বিবাহে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়াছিলেন। তাই তাঁর অপ্রত্যাশিত আগমনে কাতোগৃহিণী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। অভ্যাগতকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু বিধবার আগমনের কারণ যখন শুনিলেন তখন তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। যে-হাতে কাতাওকা ও কাওয়াশিমা পরিবারকে যুক্ত করিয়াছিলেন, কে ভাবিয়াছিল সেই হাতেই সে বাঁধন ভাঙিবার নিমন্ত্রন আসিবে!

কাতোগৃহিণী অভ্যাগতের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া ছিলেন। ভাবিতেছিলেন কি সাহসে সে তাঁহার নিকটে আসিয়া অম্লান বদনে এই-সব নিষ্ঠুর কথা বলিতেছে। তাকেওর মাতা কিন্তু হাঁটুর উপর হস্তদ্বয় বদ্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে বিপুল বপু খাড়া করিয়া বসিয়া রহিলেন। কাতোগৃহিণী ভাবিতেছিলেন, বিধবা পরিহাস করিতেছে না ত? তাহার মাথার নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল হয় নাই? কিন্তু অবশেষে বিধবা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিলেন যে, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহাই করিতে চাহেন, তখন কাতোগৃহিণীর মনে দারুণ ক্রোধ আসিয়া বিস্ময়ের স্থান অধিকার করিল। ইচ্ছা হইল স্বার্থপর বিধবাটাকে বেশ কয়েকটা কড়া কথা শুনাইয়া দান। কিন্তু নামি যে তাঁর

কাছে কন্যারই মত প্রিয়, তাহার জন্য ভর্ৎসনার কথাগুলো মনে মনে চাপিয়া গেলেন। বিধবাকে কত বুঝাইতে লাগিলেন, তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, অবশেষে তাঁহার কৃপাভিক্ষা পর্য্যন্ত করিলেন। সে-সব কথা তাঁর কর্ণে প্রবেশও করিল না! ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে কাতোগৃহিণীকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, এ-সব বাজে কথা শুনিবার অবসর তাঁহার নাই, তিনি যেন নামির পিতা-মাতার নিকট সংবাদটা লইয়া যান। বিধবার কথা শুনিতে শুনিতে কাতোগৃহিণীর সামনে পীড়িতা ভগ্নী-কন্যা নামি, নামির মাতা বা তাঁহার ভগ্নীর মৃত্যুশয্যা, দুহিতার মঙ্গলেচ্ছু জেনারেল—একে একে সকল ছবিগুলিই ভাসিয়া উঠিল। ক্রমে ভাবনার ভার বাড়িয়া উঠিল, চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন—পতির মতের অপেক্ষা না করিয়াই জবাব দিয়া দিলেন—কাতো-পরিবার প্রেমের বন্ধনে এই দুই পরিবারকে যুক্ত করিয়া দিয়াছিল। এখন আবার ফিরিয়া তাহারা এই নিষ্ঠুর অন্যায় কার্য্যে হস্ত কলঙ্কিত করিতে কিছুতেই পারিবে না! কিছুতেই নয়!

গিন্নি সরোষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই দিন সন্ধ্যাকালে পত্র লিখিয়া য়্যামাকিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভাবিলেন, ভালমানুষ তাজাকির দ্বারা এই অত্যাবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কাতোঠাকুরাণীর স্বামী উপস্থিত ছিলেন না; তাই তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া কন্যা চিজুর সাহায্যে তাকেওর জাহাজের ঠিকানা যোগাড় করিয়া তাহাকে ব্যাপার লিখিয়া পাঠাইলেন। বিধবা অন্যরূপ বলিলেও তাকেও যে এরূপ কাজের বিরোধী ইহাই তিনি বিশ্বাস করিতেন।

ইতিমধ্যে কুপিতা বৃদ্ধা একেবারে সোজাসুজি কথাবার্ত্তা কহা স্থির করিয়া য়্যামাকিকে দূতরূপে প্রেরণ করিল। তাহার কুরুমা কাতাওকার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রত্যানয়ন

আকাসাকায় লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল কাতাওকার বাড়ীর ফটক দিয়া য্যামাকির কুরুমা যখন প্রবেশ করিতেছিল ঠিক সেই সময় অশ্বপৃষ্ঠে এক জন বলিষ্ঠ সামরিক কর্ম্মচারী বাহির হইয়া আসিলেন। কুরুমার শব্দে চকিত হইয়া ঘোড়াটা লাফাইয়া পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া প্রায় সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সৈনিক সহজেই ঘোড়াটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া একটা চক্কর দিয়া ফটকের বাহির হইয়া গেলেন।

সৌম্যদর্শন অশ্বারোহী চলিয়া গেল দেখিয়া য্যামাকি গলা পরিষ্কার করিয়া জমকালো অলিন্দের দিকে অগ্রসর হইল। সে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়াছে, কিন্তু কী আশ্চর্য্য! আজ তাহার সাহসে একেবারেই কুলাইতেছে না। পূর্ব্বরাত্রে অন্ধকার কার্য্যের জন্য যখন সে কাওয়াশিমা-গৃহিনী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল তখন সে একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল; এবং আজ যখন সেই কার্য্যের সম্মুখীন হইল তখন স্বীয় হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যে নিজের উপর তাহার ধিক্কার জন্মিল। এই হৃদয়কেই সে ইতিপূর্ব্বে কাংস্যের মত দুর্দ্দমনীয় ভাবিত!

কার্ড পাঠানোর পর ভৃত্য দ্বিতীয় বার আসিল ও য্যামাকিকে বৈঠকখানা-ঘরে লইয়া গেল। একটা টেবিলের উপর চীন ও কোরিয়ার একখানা মানচিত্র বিস্তৃত, এবং তার ধারে পোড়া দেশালাইয়ের কাঠি ও ছাইদানে একগাদা ছাই অনতিকাল পূর্ব্বে যে-বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল তাহার কথা স্মরণ করাইতেছিল। এই সময়ে কোরিয়ার বিদ্রোহ, চীন সৈন্যের সঞ্চালন ও জাপানী সেনাদল প্রেরণের গুজব সমস্ত সভ্য জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। জেনারেল

পশ্চাতে-রক্ষিত সেনাদলভুক্ত হইলেও এই ব্যাপারে তাঁহার মাথা ঘামাইবার এত কথা ছিল যে, ইংরেজি পড়িবার সময়টি পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

য়্যামাকি বসিয়া বসিয়া কৌতূহলের সহিত ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় সুদূর বজ্রনিনাদের মত পদশব্দ শুনিতে পাইল এবং তৎপরে পাহাড়ের মত বিপুলকায় এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া অপর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। জেনারেলকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া য়্যামাকি চেয়ারখানা ফেলিয়া দিল। থতমত খাইয়া দু চার কথায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে চেয়ারখানা তুলিয়া ফেলিল ও তিন চার বার তাঁহাকে অভিবাদন করিল। বোধ হয় অভিবাদন ও অসভ্যতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা একই সঙ্গে চলিতেছিল।

"বসুন বসুন। আপনিই য়্যামাকি-সান? আমি আপনার নাম শুনেছিলুম কিন্তু—"

"আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বড়ই সুখী হলুম। আমার নাম হ্যোজো য়্যামাকি, মুখ্যুসুখ্যু লোক আমি।" প্রত্যেক কথার শেষে সে একবার করিয়া অভিবাদন করে, আর প্রত্যেক বারই চেয়ারটা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করে, যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, "ঠিক ঠিক।"

কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় কথা ও কোরিয়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর, জেনারেল য়্যামাকির আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কথা বলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া য়্যামাকি প্রথমে গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইল। কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে আরো দুই বার এরূপ করিতে হইল। কী আশ্চর্য্য! তাহার মুখে ত কথা অনর্গল বাহির হয়! ঠিক এমনি সময়ে কি সেগুলো কণ্ঠে আটকাইয়া গেল!

অবশেষে য়্যামাকি কহিল, "আমি কাওয়াশিমাদের বাড়ী থেকে একটা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে প্রেরিত হয়েছি।"

বিস্ময়ের সহিত জেনারেল তাঁহার ক্ষুদ্র চোখ দুটি য়্যামাকির উপর স্থাপন করিলেন।

"তাই না কি ?"

"কাওয়াশিমা-গিন্নি নিজেই আসতেন কিন্তু শেষে আমাকে পাঠালেন।"

"বুঝেচি।"

য়্যামাকি কপাল মুছিল, অনিচ্ছাসত্বেও দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল।

"ভায়কাউন্টেস কাতোকে পাঠাচ্ছিলেন বলবার জন্যে, তিনি রাজি হলেন না, অগত্যা আমাকে পাঠালেন।"

"বুঝ্‌চি, কিন্তু বিষয়টা কি ?"

"সেটা হচ্ছে এই—বলতে বাধ বাধ বাধ ঠেকচে, কিন্তু কাওয়াশিমা-গিন্নি, আপনার কন্যা—"

কিছুকালের জন্য নিমেষবিহীন চোখে জেনারেল য়্যামাকির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"তারপর ?"

"কথাটা আপনার কন্যার বিষয়ে। বলতে বড় বাধ বাধ ঠেকচে, আমরা তাঁর পীড়ার জন্যে বিশেষ চিন্তিত ছিলুম তা তো আপনি জানেন—এখন তিনি কতকটা সেরে উঠেচেন খুব সুখের বিষয় যদিও—"

"হুঁ।"

"আমাদের নিজেদের বলাটা কেমন কেমন দেখায়, আর আপনার প্রতিও বড়ই অবিচার করা হয়, কিন্তু তার অসুখটা বড় গোলমেলে। কাওয়াশিমা-পরিবারটিও ছোট, আর সেখানে তাকেও-সান কেবল একমাত্র পুরুষ, সেই জন্যেই গিন্নি তাঁর জন্যে এত ভাবেন। কি

ক'রে বলি বলুন, আপনার প্রতি বড়ই অবিচার করা হয়, পীড়াটা এমনি যে যদি আর কারো হয়ে পড়ে—হয়ত নাও হতে পারে—কিন্তু সাবধানের মার নেই, যদি কোনো গতিকে বাড়ীর মালিক তাকেও-সানের হয়ে পড়ে ত কাওয়াশিমা বংশই লোপ পাবে। আজকাল অবশ্য বংশলোপ বিশেষ একটা কিছু নয়, যাই হোক—সত্য বলতে কি—বলাও মুস্কিল কিন্তু—তাঁর অসুখটা এমন যে—"

য়্যামাকি থতমত খাইয়া গেল। হোঁচট খাইয়া খাইয়া বক্তৃতায় অগ্রসর হইতে হইতে তাহার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছে। জেনারেল নির্ব্বাক হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এক্ষণে দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন।

"ব্যস্! বুঝেচি। মোট কথাটা হচ্ছে, নামির ব্যারাম সাংঘাতিক, সেই জন্যে আপনারা তাকে ফিরিয়ে নিতে বলেন। বেশ!"

তিনি মস্তক নোয়াইলেন ও চুরুটের ভস্মাবশেষ ভস্মাধারে রাখিয়া হাত মুড়িয়া বসিলেন।

"আপনি ঠিকই বুঝেচেন আমার পক্ষে বলাটা ভারি মুস্কিল। আশা করি আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না।"

"তাকেও-সান ফিরেচেন?"

"আজ্ঞে না, তিনি ফেরেন নি। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই সব কথাই জানেন। আশা করি আপনি কথাটা ভালোভাবেই নেবেন।"

"আচ্ছা।"

জেনারেল পুনরায় মাথা নোয়াইলেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া বুকের উপর হাত দুই খানি বদ্ধ করিয়া রহিলেন। এত সহজেই কার্য্যোদ্ধার হওয়াতে য়্যামাকি হৃষ্টচিত্তে মুখ তুলিয়া দেখিল জেনারেল চোখ বুজিয়া অধর চাপিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে কেমন একটা রুদ্র ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"য়্যামাকি-সান!"

চোখ খুলিয়া জেনারেল নিবিষ্টমনে য়্যামাকির মুখ দেখিতে লাগিলেন।

য়্যামাকি কহিল "আজ্ঞে?"

জেনারেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ছেলে পুলে আছে বোধ হয়?"

য়্যামাকি প্রশ্নটির যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না, মাথা নোয়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।"

"য়্যামাকি-সান, বোঝেন ত আপনার ছেলে মেয়ে আপনার কত আদরের?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা আমি সম্মত হলুম। কাওয়াশিমা-গিন্নিকে বলবেন, কোনো ভাবনা নেই। নামিকে আজই নিয়ে আসা হবে। আপনাকে কষ্ট দিলুম কিছু মনে করবেন না।"

য়্যামাকি উঠিয়া অনেক বার অভিবাদন করিল। উদ্দেশ্য সফল হওয়াতে আনন্দ হইতেছিল, এবং তাহার আগমনে যে-সব দুঃখের সৃষ্টি হইল তার জন্য কিছু দুঃখও যে হয় নাই তা নয়।

আগন্তুককে বাড়ীর অলিন্দ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া জেনারেল দ্বার বন্ধ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন

তাকেও চলিয়া যাইবার পর নামির বড়ই একলা বোধ হইতে লাগিল, জুসির বাড়ীতে দিনগুলা যেন আর কাটে না। কোন প্রকারে সেখানে পাঁচ সপ্তাহ কাটিল, অবশেষে গোধুম কাটা হইয়া গেল, পদ্ম ফোটারও সময় আসিল! শরীরের অবস্থা দেখিয়া কিছু-কালের জন্য সে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসক অভয় দেওয়ায় শীঘ্রই আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সম্প্রতি হাকোদাতে হইতে স্বামীর একখানি পত্র পাইয়া সে আস্বস্ত হইয়াছে। চিকিৎসকের উপদেশ-মত সারিয়া উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে তাকেওর প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করিয়া রহিল। গত কয়েক দিন যাবৎ কিন্তু তোকিওর সহিত সকল যোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, বাড়ী হইতে পিতামাতার পত্র বা ঈদামাচি হইতে মাসীমাতার কোন পত্র আসে নাই।

সময় কাটাইবার জন্য সে একটা ফুলদানিতে বন্য পদ্ম সাজাইতে-ছিল। পরিচারিকা জল লইয়া প্রবেশ করিলে তাহাকে কহিল, "আচ্ছা ইকু, চিঠি আসচে না কেন বল্ দেখি?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "হয়ত তাঁরা সবাই ভালো আছেন, লেখবার-মত কিছু নেই। শীগ্গিরই চিঠি পাবে'খন! হয়ত আজই সকালে কেউ এসে পড়বে। বাঃ! খাসা ফুল! আহা এগুলো শুকিয়ে যাবার আগে কর্ত্তা যদি ফিরতেন!"

নামি হস্তস্থিত পদ্মগুলির দিকে চাহিয়া কহিল, "চমৎকার, নয়? আমার কিন্তু মনে হয় এগুলি যেখানে ছিল সেখানে থাকলেই

ভাল হোত। এমনি ক'রে তুলে আনা ভারি নিষ্ঠুর বলে' বোধ হয়!"

এমন সময়ে বাড়ীর ফটকের অভিমুখে কুরুমা আসার শব্দ শোনা গেল। ভায়কাউণ্টেস কাতো আসিতেছিলেন। বিধবা-কাওয়াশিমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিবার পর দিন তাঁহার ভাবনা হওয়াতে তিনি কাতাওকার বাড়ী গিয়াছিলেন। সেখানে বিস্ময়ের সহিত শুনিলেন যে ইতিপূর্ব্বেই কাওয়াশিমার দূত আসিয়া জেনারেলের সম্মতি লইয়া ফিরিয়া গেছে। তাকেওর প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার মতলবটি ব্যর্থ হইয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, ব্যাপারটা তাঁহার আয়ত্তের এত বাহিরে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায় যখন নাই, তখন তিনি জুসিতে গিয়া বোনঝির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে তার পিত্রালয়ে লইয়া আসা মনস্থ করিলেন; কারণ নামির পিতা ভাবিতেছিলেন যে বাড়ী হইতে দূরে এ সংবাদ শুনিয়া নামি বড়ই বিচলিত হইবে।

"এই যে মাসীমা এসেচ, বড় খুসী হলুম তোমায় দেখে। এখুনি তোমার কথা হচ্ছিল।"

ইকু নামির দিকে ফিরিয়া কহিল, "দেখলেন ত ঠাকরুণ, ইকুর কথাই ঠিক!"

"কেমন আছ মা নামি? সেবারের পর আর বিশেষ কিছু হয়নি ত?" তিনি মুখ তুলিয়া নামির মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না।

নামি কহিল, "না কিছু না, ভালোই আছি। আমি সেরে উঠচি। তুমি কেমন আছ মাসীমা? তোমায় ত ভালো দেখাচ্ছে না!"

"আমি? আমার মাথা ধরেচে। যে সময় পড়েচে! সম্প্রতি তাকেওর চিঠি পেয়েছ না কি?"

"হ্যাঁ পরশু তিনি হাকোদাতে থেকে লিখেছেন। শীগ্‌গিরই ফিরবেন। না, আসবার দিন এখনো ঠিক হয় নি। আমার জন্যে কিছু আনবেন, লিখেছেন।"

কাতোগৃহিণী কহিলেন, "তাই না কি?" আপন মনে বলিলেন, "এখন আর কেন, দেরী হয়ে গেছে"—তারপর চমকিয়া বলিলেন, "দু'টো বেজেছে, না?"

নামি জিজ্ঞাসা করিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন? বসুন, জিরুন ভালো ক'রে। ওচিজুসান কেমন আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সে তোমায় ভালোবাসা জানিয়েছে"—এই কথা বলিয়া মাসীমা ইকুর নিকট হইতে এক পেয়ালা চা লইলেন, কিন্তু এতই অন্যমনা যে উহা পান করিতে ভুলিয়া গেলেন।

ইকু কহিল, "কোনো রকম সঙ্কোচ করবেন না এখানে। আপনার জন্যে ভালো মাছ নিয়ে আসি?"

"তা আন।"

মাসীমার যেন ঘুম ভাঙিল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, মুহূর্ত্তকাল নামির মুখপানে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন।

"না না এনো না। আজ আমার সময় নেই। নামিসান তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"আমাকে? কোথায়?" নামি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

"হ্যাঁ, ডাক্তারের পরামর্শে তোমার বাবা তোমায় দেখতে চান। তোমার শাশুড়ীও সম্মত আছেন।"

"তিনি আমায় দেখতে চান? কেন?"

"এই ত বল্লুম তোমার অসুখের জন্যে। আর তোমার বাবা, তিনি তোমায় অনেকদিন দেখেন নি কি না।"

"তাই না কি?"

নামি সন্দেহের ভাব প্রকাশ করিল, ইকুও তাহাই করিল। ইকু কহিল, "আজ সন্ধ্যেবেলা ত এখানে থাকচেন?"

"না, তা পারি না। ডাক্তার বসে আছেন কি না, অন্ধকার হবার আগেই যাওয়া ভালো। এর পরের গাড়ীতেই যেতে হবে।"

"তাই না কি!"

বৃদ্ধা ইকু বিস্মিত হইয়া গেল। নামিও ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু মাসীমা সংবাদ আনিয়াছেন, পিতা তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, শাশুড়ী ঠাকরুণও এ আহ্বানের বিষয় অবগত আছেন। সে আর জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া যাত্রার আয়োজনে লাগিয়া গেল।

"মাসীমা এত ভাবচ কি? 'নার্শের' যাবার কোনো দরকার নেই, আমি ত শীগ্‌গিরই ফিরব।"

মাসীমা আসন ত্যাগ করিয়া নামিকে কাপড় পরাইতে পরাইতে কহিলেন, "ওকে সঙ্গে নাও। দরকার হতে পারে ত।"

চারিটার সময় ফটকে তিনখানি কুরুমা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনি তাঁহারা সকলে বাহিরে আসিলেন। নামির পরিধানে রূপালি ধূসর বর্ণের হালকা ক্রেপের পরিচ্ছদ, আসমানি রঙের সাটিনের একটি কোমরবন্ধ ও ডান হাতে একটি ছোট ছাতা। কাশিতে কাশিতে রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিয়া সে কহিল, "তা হলে ইকু আমি চল্লুম দিনকতকের জন্যে। সেখান থেকে এসেচি সে আজ ত কম দিন হল না! ঐ যে পোশাকটা আমি তৈরি করছিলুম—সেটা একটুখানি এখনো বাকি আছে। যাক, ফিরে এসে নিজেই তৈরি কর্‌ব'খন। তিনি ফেরবার আগে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে।"

মাসীমা ছাতায় মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার চোখে অশ্রু নামিয়া আসিয়াছিল।

অদৃষ্টের গহ্বর আমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় সদাই সংগোপনে

মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। অতর্কিতে আমরা উহার মধ্যে গিয়া পড়ি, এড়াইবার শক্তি নাই। কিন্তু যখন নিকটে আসি তখন কেমন একটা অবর্ণনীয় ভীতি আমাদের হৃদয়ের মাঝে শীতের কম্পন জাগাইয়া তোলে।

মাসীমার প্রতি বিশ্বাসবশত এবং পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রশ্ন না করিয়াই নামি বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু কুরুমায় চড়িয়াই তাহার অন্তঃকরণ কি এক অজানা আশঙ্কায় ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। নিজের অবস্থার বিষয় সে যতই চিন্তা করে ততই যেন কিছুরই কুলকিনারা করিতে পারে না। মাসীমার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ জন্মিল। ট্রেনের মধ্যেও মনের ভার লাঘব হইল না। শিন্‌বাসি ষ্টেশনে যখন সে পৌঁছিল তখন তাহার মন অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার ভারে এতই পীড়িত হইতে লাগিল যে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর পিতৃগৃহে প্রত্যাগমনের আনন্দ সে একরকম ভুলিয়াই গেল।

লোকের ভিড় চলিয়া গেলে ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া সেবিকার স্কন্ধে ভর দিয়া নামি ধীরে ধীরে মাসীমাতার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ফটক পার হইবার সময় দেখে নিকটেই একজন সামরিক কর্ম্মচারি দাঁড়াইয়া। সে কথা কহিতেছিল; হঠাৎ নামির দিকে ফেরাতে তাহার সহিত চোখোচোথি হইল। সে চিজিওয়া, নামির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে ইচ্ছাপূর্ব্বক টুপি খুলিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। সে চাহনি ও হাসি নামির হৃদয়ে একটা অননুভূতপূর্ব্ব কম্পন জাগাইয়া তুলিল, সে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাহার দারুণ শীত বোধ হইতে লাগিল। সে-শীত তাহার পীড়াহেতু নহে,—গাড়ীতে চড়িবার বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত তাহার কাঁপুনি থামিল না।

মাসীমাতা কথা কহিলেন না, নামিও স্তব্ধ হইয়া রহিল। গাড়ীর

জানালায় যে সন্ধ্যাসূর্য্য রশ্মিপাত করিতেছিল, তাহাও অস্তাচলে ডুবিয়া গেল। গোধূলির সময় তাহারা কাতাওকার বাড়ীতে পৌছিল।

বাদাম ফুলের মৃদু সুরভিতে বাতাস আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফটকের নিকট একখানা মোট-বোঝাই গাড়ী। পার্শ্বের একটি অলিন্দে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। ভিতরে কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল। সমস্ত দৃশ্যটা দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন কেহ স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। নামি এসব ব্যাপারের অর্থ কি ভাবিতে ভাবিতে মাসীমাতা ও সেবিকার সাহায্যে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেই কাতাওকাগৃহিণী তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারে আবির্ভূত হইলেন। কহিলেন, "এই যে, এত শীগ্‌গির! আপনাকে বড় কষ্ট দিলুম!"

কাতাওকাগৃহিণীর চোখ দুটি নামির মুখ হইতে সরিয়া গিয়া কাতো-গৃহিণীর মুখের উপর রক্ষিত হইল।

নামি জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ মা? বাবা কোথায়?"

কাতাওকাগৃহিণী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "তিনি পড়বার ঘরে রয়েছেন।"

সেই মুহূর্ত্তে শোনা গেল, নামির ছোট ভাই বোন সানন্দে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। মাতার নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহারা নামির দিকে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের পশ্চাতে কোমাও বাহির হইয়া আসিল।

"এই যে মীচান কীচান! কেমন আছ তোমরা? আর এই যে কোমাচান!"

ভগ্নীর আস্তিন ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে মিচি কহিল, "কি মজা! কি মজা! এবার থেকে বরাবর তুমি কেমন আমাদের সঙ্গে এখানে থাকবে! তোমার জিনিসপত্তর সব এসে গেছে।"

শিশুটিকে চুপ করিতে বলিবার সাহস কাহারো হইল না।

বিমাতা, মাসীমা, কোমা ও পরিচারিকাগণ সকলেরই দৃষ্টি নামির মুখের উপর স্থাপিত হইল।

"কি ?"

নামি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। বিমাতার ও মাসীমার মুখের উপর চোখ বুলাইয়া অবশেষে অলিন্দের পাশে একটা ঘরে জড়ো-করা জিনিসগুলির উপর চোখ পড়িল। বাড়ীতে সে যে-সব আয়না, দেরাজ, পোশাকের বাক্স প্রভৃতি রাখিয়া আসিয়াছিল নিঃসন্দেহ সেগুলিই জড়ো করা রহিয়াছে !

থর থর করিয়া নামির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে সে মাসীমাতার হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ফেলিল। সকলেই কাঁদিতে লাগিল।

গুরু পদশব্দ শোনা গেল—পিতা আসিলেন।

"বাবা !"

"এস মা, তোমায় দেখবার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলুম"—বলিয়া জেনারেল নামির কম্পিত ক্ষীণ তনু তাঁহার বিশাল বক্ষে টানিয়া লইলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছে, বাড়ী নিঃস্তব্ধ। জেনারেলের পাঠাগারে দুটি লোক—পিতাপুত্রী। যে-দিন নামি আর কখনো ফিরিবে না মনে করিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল ও যে-দিন সে পিতার শেষ উপদেশ শুনিতেছিল, সে-দিন যেমন আজও তাহাদের তেমনি অবস্থা—কন্যা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিতার কোলের উপর মাথা রাখিয়া রোদন করিতেছিল ও পিতা রোরুদ্যমানা কন্যার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

তাকেও ও তাহার মাতা

"খবর! খবর! কোরিয়ার খবর!"—চীৎকার করিতে করিতে কাগজওয়ালা ছোকরা ঘণ্টা বাজাইয়া ছুটিয়া গেল। তারপরেই কাওয়াশিমার বাড়ীর দ্বারে একখানি কুরুমা আসিয়া দাঁড়াইল। তাকেও বাড়ী ফিরিল।

তাহার অনুপস্থিতিকালে যে-ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা যখন তাকেও জানিতে পারিবে, তখন সে যে ক্রুদ্ধ হইবে এ-কথা তাহার মাতা জানিতেন—কিন্তু তরবারির আঘাত যে প্রথমে করে তাহারই জিত হয়। তাই সুখবরটা য়্যামাকি যে দিন আনিল সেই দিনই অবিলম্বে তিনি নামির যা কিছু জিনিসপত্র সমস্তই কাতাওকার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। মনে হইল কাজটা একটু নিষ্ঠুর হইতেছে। কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত না হইলে চলে না—তাই কাজটা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। পরের দুই তিন দিন বেশ মনের আনন্দেই ছিলেন। এদিকে ভৃত্যেরা স্বভাবতই তরুণ দম্পতির পক্ষালম্বন করিয়াছিল। তাহারা এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া গেল ও তাকেও প্রত্যাবর্ত্তন করিলে একটা বিষম কাণ্ড হইবে আশঙ্কা করিতে লাগিল। এমন সময় তাকেও ফিরিয়া আসিল। কাতোগৃহিণী তাহাকে তাড়াতাড়ি যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তা ফিরিবার পথে সে পায় নাই, মাতা তো পত্রে এ বিষয়ের কোনো উল্লেখই করেন নি। সেজন্য প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া য়োকোসুকা পৌঁছিয়া প্রথম সুযোগেই সে বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে।

বৈঠকখানার দিক হইতে জনৈক পরিচারিকা আসিয়া চা প্রস্তুত করিতে রত অন্য একজন পরিচারিকাকে কহিল—"ওলো মাচ্চান্

শুন্‌ছিস্‌! বাবুকে দেখে ত বোধ হয় না তিনি ব্যাপারটার কিছু জানেন। আহা! গিন্নীর জন্যে উপহার পর্য্যন্ত এনেছেন!"

মাৎসু সবিস্ময়ে কহিল—"তাই না কি! ছেলেকে না জানিয়ে বউকে ত্যাগ করে এমন মা কি পিরথিমিতে আছে গা? রোসো না, দেখবে'খন বাবু কত রাগ করেন! মাগী যেন ডাইনী!"

পরিচারিকা কহিল—"তা আর বলতে। আমি ত বাপু জন্মে কখনো এমন খিটখিটে, কিপ্টে, অবুঝ মেয়েমানুষ দেখি নি। আমাদের খুব বকতে পারে, নিজে কিন্তু জানে না কিছুই। সাৎসুমার একটা গরীব চাষার মেয়ে বইত নয়! সাত জন্ম এমন জায়গায় থাকতে নেই!"

"আচ্ছা বাবুর বউকে যে ত্যাগ করা হয়েছে সে কথা বুঝতে বাবুর এত দেরীই বা হচ্ছে কেন?"

"সেতো আর আশ্চয্যি নয়, উনি কোন্‌ মুলুকে ছিলেন একবার ভাব না। মা যে ছেলেকে জিজ্ঞেস না করে' সামান্য একটা চাকরাণীর মত বউকে খেদিয়ে দেবে, এ কথা আর কে ভাবতে পারে বল্‌? আর বাবুও ছেলেমানুষ বইত নয়! ওঁর জন্যে আমার দুঃখ্যু হয়, কিন্তু ওঁর স্ত্রীর জন্যে হয় আরো। আহা তাঁর কি দুঃখ্যু—ঐ যে! বুড়ী চেঁচাতে আরম্ভ করেচে। কাজে মন দে মাচ্চান্‌, কাজে মন দে! নইলে মরবি বকুনি খেয়ে।"

ভিতরের একটা ঘরে বিধবা ও তাহার পুত্রের কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর উচ্চে উঠিতেছিল।

তাকে বলিতেছিল—"কিন্তু তুমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমি ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে ব'লে। তুমি আমায় একবার লিখলে না পর্য্যন্ত, নিজের মতলবে সব সেরে ব'সে আছ! আমি এ সহ্য করতে পারবো না। এখানে আসবার সময় জুসিতে নেমেছিলুম, নামিকে দেখতে না পেয়ে ইকুকে জিজ্ঞেস করলুম। সে বল্লে কার্য্যগতিকে

নামিকে তোকিও যেতে হয়েছে। তখনি কেমন আশ্চর্য্য ঠেকেছিল, কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তুমি—এ সব ভারি বাড়াবাড়ি, জুলুম !”

বিধবা কহিল—“ভুল হয়েছিল, মাপ চাইচি। আমি নামিকে যে পছন্দ করি না তা তো নয়, তবে কি না তোমায় ভালবাসি তাই—”

“তুমি সদাই কেবল আমার কথা ভাবছ! কিন্তু সম্মান, সুনাম বা হৃদয়ের দিকে তোমার কোনো দৃষ্টিই নেই।”

“তাকেও ! তুই পুরুষ না মেয়ে ? এখনো তুই ভাবছিস নামির কথা ? আমি যে তোর মা হয়ে নিজেকে এতটা ছোট করলুম সে কথা ভাবা নেই !”

তাকেও কহিল—“কিন্তু তুমি যা করেছ তা সহ্য করা যায় না।”

“যাই হোক, এখন আর উপায় নেই। ওঁরা সম্মত হয়েছেন, সব পাকাপাকি স্থির হয়ে গেছে। এখন আর তুমি কি করবে বল ? বলে রাখচি, না ভেবে চিন্তে যদি কিছু করে বোস, তা কেবল তোমার মার লজ্জা নয়, তোমারও।”

তাকেও স্থির হইয়া শুনিতেছিল, সে ক্রোধে অধর দংশন করিল। সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুগ্না পত্নীর জন্য যে আপেলের চুপড়ি আনিয়াছিল তাহা আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল। কহিল—“মা, তুমি নামিকেও মারলে আর আমাকেও মারলে তার সঙ্গে। আমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না, এই শেষ !”

তৎক্ষণাৎ তাকেও য়োকোস্থকায় তাহার যুদ্ধজাহাজে ফিরিয়া গেল।

কোরিয়ার ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া ওঠাতে জুলাই মাসের মাঝামাঝি চীনের বিরুদ্ধে জাপান সমর ঘোষণা করিল। সেই মাসের বিশ তারিখে তাকেওর যুদ্ধজাহাজ মাৎসুশিমা সাসেবোতে অন্যান্য যুদ্ধ-জাহাজের সহিত সম্মিলিত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইল। ব্যর্থ নিরানন্দ জীবন বহন করা অপেক্ষা গোলার আঘাতে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া তাকেও তৎক্ষণাৎ কার্য্য গ্রহণ করিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিল।

জেনারেল কাতাওকা অবিলম্বে তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারির এক নিভৃত কোণে নামির জন্য ছোটখাট একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং বৃদ্ধা ইকুকে জুসি হইতে আনাইয়া কন্যার সহিত থাকিতে আদেশ দিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি রাজকার্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং নামিকে সস্নেহে পত্নীর হাতে সমর্পণ করিয়া তের তারিখে হিরোশিমায় সামরিক বিভাগের সদর আপিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পর মাসে তিনি জেনারেল ওয়ামা য়্যামাজি প্রভৃতির সহিত জাহাজে লায়োটাং যাত্রা করিলেন।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহাদের বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া আসিলাম তাহাদের সকল সুখদুঃখ দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কিছুকালের জন্য চীন-জাপান যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিপুল জাতীয় আন্দোলনে ঢাকা পড়িয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পীড়াবসানে

বাতায়নের তলে পাখীর গানে জাগ্রত হইয়া তাকেও তন্দ্রালস নয়ন মেলিল। বিছানার উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া মশারিটি সরাইয়া দিল। পাহাড়ের উপর দিয়া উদীয়মান প্রভাত-সূর্য্যের আলো জানালার মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া প্রবেশ করিতেছিল। পাহাড়গুলি তখনো প্রাতঃকালের কুয়াসায় আচ্ছন্ন, উর্দ্ধে শরতের আকাশ স্বচ্ছ নির্ম্মল। তাহার তলে জানালার সম্মুখে চেরিগাছের ডালগুলি রক্তিমাভায় মণ্ডিত হইয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ডালের উপর দুই তিনটি ছোট পাখী কিচির মিচির করিতে করিতে লাফালাফি করিতেছিল। অবশেষে তাহারা সকলে ঘরে উঁকি মারিল, এবং অর্দ্ধশায়িত তাকেওর সহিত চোখোচোখি হইতেই যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হঠাৎ উড়িয়া পালাইল। তাহাদের পশ্চাতে বায়ুহীন শূন্যে কেবল একটি শুষ্ক পত্র ঝরিয়া পড়িল।

প্রভাতের যে দূতগুলি আসিয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়াছে

তাহাদের কথা ভাবিয়া তাকেও ঈষৎ হাস্য করিল। পুনরায় বালিসে মাথা রাখিয়া শুইবার চেষ্টায় যেন বেদনায় সে কপাল কুঞ্চিত করিল, অবশেষে আরাম করিয়া শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল।

শান্ত প্রভাত—কোথাও অশান্তির লেশমাত্র নাই। একটা মোরগ ডাকিয়া উঠিল। দূরে জেলেরা গান গাহিতেছিল।

তাকেও চোখ মেলিল, একটু হাসিল, আবার চোখ বুজিল—যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন!

আজ এক মাসের অধিক হইল সে যুদ্ধে আহত হইয়া সাসেবোর হাঁসপাতালে আসিয়াছে।

শত্রুপক্ষের গোলার টুকরায় আহত হইয়া ডেকের উপর সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যবশত পায়ের উপর আঘাত হাড় পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই, অন্যান্য আঘাতগুলি আঁচড় ছাড়া আর কিছু নয়। তাহার দলের কাপ্তেন গোলার ঘায়ে টুকরা টুকরা হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল, অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও সকলে মরিয়াছিল, কেবল কয়েকজন গোলন্দাজ বাঁচিয়াছিল। এমন অবস্থায় তাকেও যে বাঁচিয়া গিয়াছিল ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের কথা। নৌ-হাঁসপাতালে আসিয়া প্রথমে সে জ্বরবিকারে ভুগিয়াছিল; কিন্তু তাহার তরুণ বয়স, তাই শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে তার অবস্থা ভালো হইয়া উঠিল। এক মাসের পর এখনো অল্প অল্প বেদনা অনুভব করিলেও, সে কার্বলিকের-গন্ধে-ভরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরের মুক্ত শরতের বাতাসে বাহির হইবার মত সারিয়া উঠিয়াছিল। আবার কবে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইবে সে এখন কেবল সেই দিনের অপেক্ষায় রহিয়াছে!

যে-জীবনকে সে ধূলার ন্যায় অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়াছিল সে-জীবন গেল না। জ্বর ও বেদনার উপশমের সঙ্গে বাঁচিবার সাধ ফিরিয়া আসিল, সেই সঙ্গে সেই পুরানো দুঃখ ও চিন্তাও ফিরিল।

সাপ তাহার চর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু মানুষ তা পারে কৈ? তাই তাকেওর স্মৃতিসূত্র, যাহা কিছুকালের জন্য যুদ্ধ ও যাতনার ভিড়ে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে, মন শান্ত হইয়া আসিলে, ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু দারুণ পীড়া যেমন আমাদের দেহের পেশীগুলিকে নূতন করিয়া সতেজ করে, তেমনি তাকেও মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি হইয়া যে-অভিজ্ঞতা লাভ করিল তাহা তাহার চিন্তাধারাকে নূতন রূপ প্রদান করিল। সেই মহাযুদ্ধ এবং তার পূর্ব্বেকার ও পরবর্ত্তী আশ্চর্য্যজনক ঘটনাগুলি ঝড়ের মত তাহার মনকে তোলাপাড়া করিয়া ফেলিয়াছে। ঝড় এখন থামিয়া গেছে, কিন্তু তাহার হৃদয়-সমুদ্রে সে-ঝড়ের প্রভাব এখনো বর্ত্তমান, এবং যে-মনোভাব সে-হৃদয়সমুদ্রে ভাসিতেছিল তাহা এখন ভিন্নমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। মাতার উপর আর তাহার রাগ নাই। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে সে নামির স্মৃতিটি রক্ষা করিয়াছে। সে যেন আর নাই। যখনি তাহার কথা ভাবে, মনে হয় যেন কোন্ সুদূরের বিষাদমাখা সুমধুর সঙ্গীত শুনিতেছে!

তাজাকি আসিয়াছিল। তাকেও তাহার নিকটে মাতার কথা এবং কিছু কিছু নামির কথাও শুনিয়াছে। প্রভুর মনে কষ্ট দিবার ভয়ে তাজাকি বলে নাই যে য্যামাকির কন্যা আসিয়া কিছুদিন তাকেওর বাড়ীতে বসবাস করিয়া গেছে—তাকেওর গৃহিণী হইবার আশায়। নামির বিষয় অল্প যা শুনিল তাহাতেই তাকেও অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রতি রাত্রে স্বপ্নের মাঝে সেই রুগ্না তরুণী পত্নীর মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিত,—নির্জ্জন বাড়ীতে একাকিনী সে কেমন করিয়া দিন যাপন করিতেছে, বাতাস সেখানে দেবদারুকুঞ্জের মধ্যে কী

বিষাদের সুর গাহিয়া ফিরিতেছে! কখনো বা এ ছবির স্থানে ইয়ালুর যুদ্ধের রুদ্র ছবি জাগিয়া উঠিত।

সপ্তাহ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল তাকেও সেই কথা ভাবিতেছিল: খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া হাই তুলিয়া সে জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল। পূর্ব্বদিন তাহার ঘরের সঙ্গী চলিয়া গিয়াছিল,—সে একাকী। দিন শেষ হইয়া আসিতেছিল। ঘর প্রায় অন্ধকার, বাহিরে ঝির্ ঝির্ করিয়া শরতের বৃষ্টি পড়িতেছিল। পাশের ঘরে কোন রোগীর বৈদ্যুতিক চিকিৎসা হইতেছিল—যন্ত্রের গুন্ গুন্ শব্দ অবিরাম বারিপতনের শব্দের সহিত মিশিয়া নির্জ্জনতা আরো যেন বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে শার্শির উপর বৃষ্টির ঝাপট ফোয়ারার মত কেমন আসিয়া পড়িতেছিল সে তাহাই দেখিতেছিল। বাহিরের বারিসিক্ত গাছপালা ঝোপঝাড়গুলো এক একবার দেখা দিয়া পরক্ষণই অদৃশ্য হইতেছিল। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে কিছুকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ কম্বল টানিয়া মাথা ঢাকিয়া ফেলিল।

"আপনার একটি বাক্স আর একটি পার্সেল এসেছে। ঘুমোলেন না কি?"

তাকেও মুখ বাহির করিয়া দেখিল বিছানার ধারে একটি ছোকরা দাঁড়াইয়া—একটা কাগজের পার্সেল ও দড়িবাঁধা একটা বড় বাক্স লইয়া।

"ও আমার জন্যে না কি? কোত্থেকে এসেচে?"

ছোকরা প্রেরকের নাম পড়িল। সে নাম তাকেও কখনো শোনে নাই।

"খোল ত ওগুলো।"

তেলা কাগজটি খোলা হইলে একটি বেগুনে রঙের কাপড়ে-মোড়া

পুলিন্দা বাহির হইল। সেটি খুলিলে দেখা গেল. একটি হাল্কা পশমী পোশাক, নরম রেশমের একটি ভিতরের পোশাক, সাদা ক্রেপের কোমরবন্ধ, তুষারশুভ্র একজোড়া জাপানী মোজা, চওড়া হাতাওলা একটি জামা। বাক্সে ছিল তাহার প্রিয় বড় বড় নাশপাতি ও টাটকা কলা।

তাকেওর অন্তঃকরণ স্পন্দিত হইতে লাগিল।

"কোনো চিঠি ছিল না এর মধ্যে ?"

ছোকরা সর্ব্বত্র খুঁজিল কিন্তু এক ছত্র লেখাও কোথাও মিলিল না।

"দেখি, দাও ঐ তেল-কাগজখানা।"

কাগজের উপর তাকেও নিজের নাম দেখিল, হৃদয় তাহার আনন্দে নাচিয়া উঠিল। হস্তাক্ষর সে চিনিয়াছে। সে! সে! সে নয় ত আর কে! পোশাকের প্রত্যেক সেলাইয়ে তাহার অশ্রুর চিহ্ন দেখিতে পাইতেছে না কি! দেখিতেছে না, দুর্ব্বল হাতের লেখা কেমন কাঁপিয়া গেছে! দেশ কাল ভুলিয়া গিয়া তাকেও বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

তাকেও এখন বুঝিল, নামি চিরদিনের জন্য তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সে হৃদয়ে অসীম ভালোবাসার আর সঙ্কুলান হইতেছে না। দিনে সে তাহার কথা ভাবে, রাতে স্বপ্নে দেখে তাহাকেই।

কিন্তু স্বপ্ন যেমন, বাস্তবিক জগৎ তো তেমন স্বাধীন নয়। জগতের তুচ্ছ লোকাচার তো দূরের কথা, তাকেও বিশ্বাস করিত, মৃত্যুও পত্নীকে তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহার বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া দেখিল যে, সেই তুচ্ছ বিধি আচারগুলো স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান

সৃজন করিয়া রাখিয়াছে। জগৎ যাই করুক, সে চিরকাল তাহার পত্নী! কিন্তু মাতা নামিকে তার নামে ত্যাগ করিয়াছেন এবং পত্নীর পিতা তাহাতেই সম্মত হইয়াছেন। জগতের চোখে তাহাদের মধ্যে আর কোনো সম্বন্ধ নাই। আরোগ্যলাভ করিয়া আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা কি সম্ভব হইবে না? মনকে যতই প্রবোধ দিক যে কাজটা তুচ্ছ সামাজিক ব্যাপারমাত্র, তবুও তাকেও কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তাহাদের পুনর্মিলন কোনোপ্রকারে সম্ভব—বরং বিপরীত। সে জানিত যে এরূপ প্রত্যেক চেষ্টা ব্যর্থ তো হইবেই, অধিকন্তু তাহা মাতা ও নিজের মধ্যেকার ব্যবধান আরো বাড়াইয়া তুলিবে। মাতার ইচ্ছায় বাধা দিবার জ্বালা সে যথেষ্ট ভোগ করিয়াছে!

এই বিশাল পৃথিবীতে বাস করিয়া ভালবাসিবার স্বাধীনতা থাকিবে না, ইহা অসহ্য। কিন্তু উপায়ও তো নাই। দিনের পর দিন এই অশান্তি বহন করিয়া কাটিতে লাগিল। মনে মনে তাকেও শপথ করিল, নামিই তাহার পত্নী—জীবনে মরণে!

সেদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙিলে তাকেও সেই কথাই ভাবিতেছিল। ডাক্তার প্রত্যহ যেমন আসেন আজও তেমনি আসিলেন। অবিলম্বে ক্ষত শুকাইয়া যাইবে বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তারপর মাতার একখানা পত্র আসিল। তাজাকির নিকট তিনি শুনিয়াছেন তাকেও সারিয়া উঠিতেছে, তাই আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, চিকিৎসক অনুমতি দিলেই সে যেন শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফেরে—তাকেওর সহিত তাঁহার প্রয়োজনীয় কথা আছে। কথা আছে! যে কথা সে ভয় করে, যাহাকে সে এড়াইতে চায়, সেই কথা নয় তো? তাকেও ভাবিতে লাগিল।

সে তোকিও ফিরিল না।

নোভেম্বর মাসের প্রারম্ভে, পীতসমুদ্রের যুদ্ধের পর মাৎসুশিমা যুদ্ধজাহাজ মেরামত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে যাইবার অনতিকাল পরেই, হাঁসপাতাল ছাড়িয়া, যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য, একখানি যাত্রী-জাহাজে তাকেও রওয়ানা হইল।

সাসেবো হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিন তাকেও দুইখানি পত্র ডাকে দিল, তন্মধ্যে একখানি মাতার জন্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রলোভন

পয়লা সেপ্টেম্বরের পর দুইমাস ধরিয়া জুসির রৌদ্রালোকিত তীরভূমিতে প্রৌঢ়বয়স্কা পরিচারিকার সহিত এক রমণীকে বেড়াইতে দেখা যাইত। গ্রীষ্মকাল আসিয়াছে, সহরের লোকেরা প্রায় সকলেই তখন বিদায় লইয়াছিল।

জেলেরা ও যে-সব পীড়িতেরা তখনো সেখানে ছিল, সকলেই রমণীর ছায়ার মত মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। যতবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, ততবারই তাহারা অভিবাদন করিত। তাহার দুঃখের ইতিহাসের কিছু কিছু সকলেই জানিত। সে রমণী নামি।

জীবনে কোনো আশা নাই, তবুও সে এখনও বাঁচিয়া আছে। নিরানন্দ শরৎকাল আবার ঘুরিয়া আসিয়াছে।

গত জুনমাসে মাসীমাতার সহিত নামি তোকিও গিয়াছিল। যে

মুহূর্ত্তে সে তাহার দুর্ভাগ্যের কথা জানিতে পারিল, তখন হইতেই ক্রমশ পীড়া গুরুতর হইতে লাগিল, রক্তবমন বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসক কিছুই করিতে পারিলেন না, পরিবারস্থ সকলে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন, এবং সে নিজেও সানন্দে মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। জীবন তাহার একটি সূতায় ঝুলিতেছিল। এক আঘাতে সহসা অতল গুহার অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া সে প্রেম বা ঘৃণা বোধ করিবার কোনো অবসর পাইল না। ভীষণ অবস্থার ভারে পীড়িত হইয়া সে কেবল মুক্তি চাহিতেছিল—মৃত্যুই মুক্তির একমাত্র উপায়, তাই সে মৃত্যুকামনা করিতেছিল। তাহার দেহ যখন রোগশয্যায় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, মন তখন পরপারে চলিয়া গিয়াছিল।

আজ বা কাল নশ্বর দেহ খসিয়া পড়িলেই জ্বালাময় জগৎকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাহার আত্মা অসীম শূন্যের মধ্য দিয়া স্বর্গে ধাইয়া চলিবে। সেখানে সে মা'র কোলে শুইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবে। মৃত্যুর দূতকে এখন সে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত। কিন্তু মৃত্যুও যে আসে না! প্রতিদিনই সে ভাবে যে সেই দিন তাহার জীবন-প্রদীপ নিবিবে, কিন্তু কোথায় অবসান? একমাস পরে, ইচ্ছা না থাকিলেও সে কতকটা সারিল, আর এক মাসে অবস্থা আর একটু ভালো হইল। আবার বাঁচিতে হইবে, অশ্রুসিক্ত দুঃখময় জীবন আবার বহন করিতে হইবে! অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! জীবনে তাহার আনন্দ নাই, মৃত্যুতে তাহার ভয় নাই। আর কেন সে চিকিৎসকের অধীন থাকিবে, ঔষধ খাইয়া ব্যর্থ জীবন কেন বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে?

কিন্তু আছে—পিতার ভালোবাসা আছে। তিনি মাঝে মাঝে দেখিতে আসেন, স্বহস্তে ঔষধ খান। তাহার জন্য ছোট একখানি বাড়ী তৈয়ার করাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে রোগমুক্ত করিবার

জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। যখনি সে পিতার পদধ্বনি শোনে, যখনি দেখে তাহার শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখিয়া পিতার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, অশ্রু তখন আর বাধা মানে না, দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে। মৃত্যুর সাক্ষাৎলাভে অসমর্থ হইয়া পিতার প্রীতির জন্য সে শরীরের যত্ন লইতে লাগিল। আর একটা কারণ ছিল--স্বামীর প্রেমে তাহার সন্দেহ ছিল না। তাঁহাকে সে ভালরকমই জানে, স্ত্রী-বর্জ্জনের দোষ তাঁহার উপর চাপানো যায় না। রোগশয্যায় যখন সে তাঁর পত্র পাইল তখন স্বামীর উপর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইল, সে অনেকটা সান্ত্বনা পাইল। অবশ্য ভবিষ্যতের কথা সে কিছুই জানে না। ভালো হইয়া উঠিলেও যে ছিন্ন বিবাহ-বন্ধন পুনরায় জোড়া লাগিতে পারে এ কথা সে মোটেই ভাবে নাই। কিন্তু সে তাহাদের আত্মার যোগে দৃঢ় বিশ্বাস করিত, আর বিশ্বাস করিত যে, তাহাদের অনন্ত প্রেম কিছুতেই ধ্বংস হইবার নহে।

পিতার স্নেহ ও স্বামীর প্রেমে স্থির বিশ্বাস ও সুচিকিৎসার গুণে নামির নির্ব্বাপিতপ্রায় জীবন-প্রদীপ আবার জ্বলিয়া উঠিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে আবার সে ইকু ও ধাত্রীকে লইয়া জুসির পল্লীভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া নামি সুস্থ বোধ করিল। স্থানটির নীরবতা তাহার মনে শান্তি আনিয়া দিল। যেদিন বৈকালবেলায় সমুদ্র গড়াইয়া দূরে সরিয়া যাইত ও নামি স্নান সারিয়া আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পাখীর কলকূজন শুনিত, তখন তাহার মনে হইত বিগত বসন্তে কে যেন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে—হয় তো বা তাহার স্বামী যে-কোনো মুহূর্ত্তে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

এখানকার জীবন ছয় মাস পূর্ব্বে যেমন এখনো প্রায় তেমনিই

আছে। ইকু ও ধাত্রীর সাহায্যে প্রত্যহ সে নিজের পরিচর্য্যা করে। চিকিৎসকের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে। মাঝে মাঝে কবিতা রচনা করিয়া বা পুষ্প সাজাইয়া আনন্দ উপভোগ করে। সপ্তাহে তোকিও হইতে একবার বা দুইবার ডাক্তার আসেন; মাসী বা মাসতুতো ভগ্নীকে তেমন ঘনঘন দেখিতে পায় না; বিমাতার সহিত ক্বচিৎ কথনো দেখা হয়। তাহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কোনো কোনো ইস্কুলের বন্ধু সহানুভূতি জানাইয়া পত্র পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সে-সব পত্রে আন্তরিকতার বড়ই অভাব। নামি কিন্তু তাহার মাসতুতো ভগ্নী চিজুর আগমনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞাতব্য সবই সে চিজুর নিকট জানিতে পারে।

বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবার পর কাওয়াশিমা পরিবার তাহার নিকট হইতে দূর হইতে দূরে সরিয়া গেছে। শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রিয়ের চিন্তা দিবারাত্রি তাহার মনে আনাগোনা করিত বটে, কিন্তু তাহার শ্বশ্রুর কথা সে কথনো ভাবিত না। চেষ্টা করিয়া সে-চিন্তাকে সে দূরে রাখিত। বৃদ্ধা শাশুড়ীর কথা স্মরণে আসিলেই মন তাহার ঘৃণা ও বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। শাশুড়ীর ভাবনা-টাকেই সে ভয় করিত, সে ভাবনা হইতে দূরে পালাইতে চাহিত। যথন শুনিল য়্যামাকির কন্যা কাওয়াশিমা-পরিবারে প্রেরিত হইয়াছে, তথন স্বভাবতই সে একটু চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য। নামি জানিত যে তাহার প্রিয়ের সহিত এ ব্যাপারের কোনো সংস্রব নাই, তাহাকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। সাগামি উপসাগরের বালুকাময় তীরভূমিতে ছোট একখানি পল্লীভবনে বাস করিলেও মন তাহার অহরহ পশ্চিমদিকে ধাবিত হইত।

পৃথিবীতে যে দুটি লোককে সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালোবাসে, তাহারা উভয়েই চীনের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। সে জুসি আসিবার অনতিকাল

পরেই পিতা হিরোশিমা যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা খুব হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—শরীরের খুব যত্ন লইয়া ভালো হইয়া উঠিয়া তিনি জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে সে যেন প্রস্তুত থাকে। সে শুনিল তাকেও সম্মিলিত রণপোত-বাহিনীর অধিনায়কের জাহাজে নাই। তাহার ভয় হইল, যদি তাকেও পীড়িত হইয়া পড়ে তো প্রয়োজনের সময় যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে না। নামি নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে এ পৃথিবীর সহিত তাহার আর কোনো সংশ্রব নাই, তবুও সে দিবারাত্রি স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া রহিল। দেশের জয়, পিতার অক্ষুণ্ণতা ও তাকেওর সফলতার জন্য চিন্তান্বিত অন্তঃকরণে সে সংবাদপত্র পাঠে মন ডুবাইয়া দিল।

সেপ্টেম্বরের শেষে সে ইয়ালুর যুদ্ধের সংবাদ শুনিল এবং কয়েক-দিন পরে আহতের তালিকার মধ্যে তাকেওর নাম দেখিল। সে রাত্রে নামি ঘুমাইতে পারিল না। তোকিওতে তাহার মাসীমাতা তাকেওর অবস্থার কথা জানিয়া তাহাকে জানাইলেন যে তাকেওর আঘাত মারাত্মক নয় এবং সে এখন সাসেবোর হাঁসপাতালে আছে। সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু পতির রোগশয্যার পাশে তাহার মন ছুটিয়া চলিল, সে যে পতির জন্য কিছুই করিতে পারে না সেই কথা বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। হৃদয়ে হৃদয়ে তাহারা অভিন্ন, কিন্তু বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে দুঃখ জ্ঞাপন করিয়া একখানা কার্ডও সে পাঠাইতে পারে না! এ দুঃখ রাখিবার কি ঠাঁই আছে!

ভাবিয়া ভাবিয়া সে একটা উপায় স্থির করিল। ইকুর সাহায্যে পতির জন্য কতকগুলি পোশাক তৈয়ার করিল। যে-সব ফল তাকেওর

খুব প্রিয়, পোশাকের সহিত সেই ফল কতকগুলি ছদ্মনামে সাসেবোতে পাঠাইল।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল, অবশেষে নোভেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন সাসেবো ডাকঘরের ছাপমারা একখানি পত্র নামির হস্তগত হইল। পত্র পড়িয়া নামি অনেকক্ষণ কাঁদিল।

শনিবার সন্ধ্যা হইতে চিজু ও নামির ভগ্নী কোমা নামির কাছে ছিল। পরদিন প্রাতে তাহারা তোকিওতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহাদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বাড়ী মুখরিত ছিল, এখন আবার তাহা স্বাভাবিক নিঃশব্দ নির্জ্জন ভাব ধারণ করিল। নামি সেই নিরানন্দ দিনে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া স্বর্গীয়া মাতার চিত্রের সম্মুখে একাকিনী বসিয়া রহিল।

আজ উনিশে নোভেম্বর—পৃথিবীতে মাতার জীবনের শেষ দিন। নামি তাঁহার ছবিখানি বাহির করিয়া ফ্রেমে পুরিয়া দেওয়ালে টাঙাইয়া দিল। চিজু যে ফুল আনিয়াছিল সেই প্রস্ফুটিত চন্দ্রমল্লিকা দিয়া ছবিখানি সাজাইল। কিছুক্ষণ ইকুর নিকট কৌতুকপূর্ণ গল্প শুনিয়া এখন সে একাকিনী চিত্রের সম্মুখে চিন্তায় নিমগ্ন।

দশ বৎসর পূর্ব্বে সে মাতাকে শেষবার দেখিয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও সে তাঁহার কথা ভুলে নাই। কিন্তু পূর্ব্বে কখনো তাঁর জন্য হৃদয় এত উতলা হয় নাই। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে সে তাঁহার নিকট তার সকল দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া দুর্ব্বল হৃদয় হইতে দুঃখের ভার অনেকটা লাঘব করিতে পারিত। কেন তাঁহার অসহায় সন্তানকে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন? এই চিন্তা তাহার চোখে সুপ্ত অশ্রু জাগাইয়া তুলিতেছিল।

মাতার মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বেকার একটি সুখের দিন তাহার

মনে পড়িল। তাহায় বয়স তখন মাত্র আট বৎসর, তাহার ভগ্নীর বয়স পাঁচ। দুজনেই ঠিক একই রকম পোশাক পরিয়াছিল—চেরি পুষ্পাঙ্কিত গোলাপী রঙের ক্রেপের পোশাক। মাতাকে মধ্যে বসাইয়া গাড়ী চড়িয়া তাহারা কুদানের সুজুকির চিত্রশালায় গিয়াছিল। তাহার সম্মুখের ছবিখানি সেই দিন সেখানেই তোলা হয়। দশ বৎসর স্বপ্নের ন্যায় অতীত হইয়া গেছে, ছবিতে যেমন, তাহার মনেও তেমনি তাহার মাতা বিরাজিত। আর সে ?

সে স্থির করিল নিজের কথা আর ভাবিবে না। কিন্তু কি করিবে ? তাহার নিরানন্দ জীবনের কথাই যে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে জাগিতেছে ! তাহার বোধ হইল, তাহার নিরাশ জীবন যেন গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন, ঘরটা যেন একটা শীতল অন্ধকূপে পরিণত হইয়াছে—সূর্য্যের একটা ক্ষীণ রশ্মিরেখাও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

হঠাৎ ঘড়িতে দুইটা বাজিল। নামির ধ্যান ভাঙিয়া গেল। দ্রুতপদবিক্ষেপে সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল, যেন পালাইতে চায়। সেখানে কেহ ছিল না। পশ্চাতে ইকু ও ধাত্রী কথা কহিতেছে শুনা গেল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া সে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে নামিয়া ফটক পার হইয়া তীরভূমিতে গিয়া পড়িল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শরৎকাল হইলেও গাঢ় পুঞ্জীভূত মেঘ নামিয়া আসিয়াছিল। সমুদ্রের মূর্ত্তি কালো করাল। প্রকৃতি স্তব্ধ, কণামাত্র বাতাসও জলরাশিকে কম্পিত করিতেছিল না—সাগরের বক্ষে যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও একখানা পালও দেখা যায় না।

নামি চলিতে লাগিল। আজ সেখানে কোনো ধীবর নাই, তীরভূমির উপর কেহ বেড়াইতেছে না। কেবল একটি ছোট মেয়ে একটি শিশুকে

পিঠে বাঁধিয়া লইয়া গান গাহিতে গাহিতে ঝিনুক কুড়াইতেছিল। নামিকে দেখিয়া সে স্মিতহাস্যে অভিবাদন করিল। নামি মাথা নত করিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল। পরক্ষণেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নত চোখে চলিতে লাগিল।

এইবার সে থামিল। বালুকাময় তীরভূমি যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে দাঁড়াইল। এখান হইতে একটা সরু পথ পাহাড়ের উপর দিয়া জলপ্রপাতের ধারে ফুদো মন্দিরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিগত বসন্তে স্বামীর সহিত নামি সেখানে গিয়াছিল।

সেই পথ ধরিয়া সে চলিল।

ফুদো মন্দির অতিক্রম করিয়া গিয়া একটা পাথরের উপর সে বসিল। গত বসন্তে এই পাথরটার উপরই সে পতির সহিত বসিয়াছিল। সে দিন আকাশ ছিল স্বচ্ছ নির্ম্মল, আর সাগর ছিল দর্পণ অপেক্ষাও মসৃণ। আজ কিন্তু আকাশ অদ্ভুত আকারের কালো মেঘে ছাইয়া গেছে, সাগর ফুলিয়া উঠিয়া একেবারে পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, আর তাহার মসীকৃষ্ণ বুকের উপর সাদা পালের চিহ্নমাত্রও নাই।

নামি পত্রখানি বাহির করিল। দ্রুতলিখিত কয়েক ছত্র মাত্র— কিন্তু নামির নিকট উহাই অমূল্য। নামিসানের কথা না ভাবিয়া একদিনও কাটে না—যতবার সে তাকেওর এই সরল উক্তি পড়ে ততবারই হৃদয় স্পন্দিত হইয়া ওঠে।

জগৎ কেন তাহার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে! সে তাহাকে এত ভালোবাসে, তবে তাহাদের বন্ধন ছিন্ন হইল কেমন করিয়া! এ পত্র কি তিনি তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া লেখেন নাই! এই পাহাড়ের উপরই গত বসন্তে তাহারা উভয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিল—চিরকাল অভিন্ন থাকিবে। সাগর সে কথা শুনিয়াছে, পাহাড় তাহা পাষাণ-বক্ষে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। কেন জগৎ এত নিষ্ঠুর হইল, কেন

লোহার পায়ে তাহাদিগকে পিশিয়া দিল ?—ওগো প্রিয়! ওগো দয়িত! এই পাহাড়ের উপরই গত বসন্তে—

নামি চোখ মেলিল। পাহাড়ের উপর সে একাকিনী বসিয়া—স্তব্ধ সমুদ্র সম্মুখে বিস্তারিত, পশ্চাতে কেবল প্রস্রবণ-ধারার নিরানন্দ ধ্বনি। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। শীর্ণ অঙ্গুলির মধ্য দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

মনের মাঝ দিয়া চিন্তা-ধারা দ্রুতগতি ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার মাথা দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, বুকের ভিতর শীতল হইয়া গেল। নামি ভাবিতে লাগিল—পতির সহিত এখানে যখন সে ছিল তথনকার কথা, প্রথম যখন সে পীড়িত হইল, ইকাওতে যে-সময় কাটাইয়াছে, যখন সে নববধূ ছিল, তখনকার কথা। মাসীমাতার সহিত যে-দিন তোকিও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, বহু বৎসর আগে মাকে যে-দিন হারাইয়াছিল; মাতার মুখ, পিতার মুখ, বিমাতা ও ভাই বোনেদের মুখ, আরো কতজনের মুখ তাহার মনের মাঝ দিয়া ক্ষণপ্রভার মত অবিরত চমকিতে লাগিল। তারপর নামির চিন্তা তাহার এক বন্ধুর উপর গিয়া পড়িল। গতকল্য চিজু তাহারই কথা বলিতেছিল। সে নামির চেয়ে দুই বৎসরের বড়—নামির বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে এক চালাকচতুর নবীন কাউণ্টের সহিত তার বিবাহ হইয়াছিল। শাশুড়ী তাহাকে খুব পছন্দ করিতেন, কিন্তু তার স্বামী তাহাকে মোটেই ভালোবাসিত না। তাহার একটি শিশুও ছিল। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য গত বৎসর স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে অল্পকাল মধ্যেই মারা যায়। বন্ধু মরিল স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, আর সে মরিতে বসিয়াছে স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! বিচিত্র এই মানুষের অদৃষ্ট! কিন্তু সবই দুঃখ আর দুর্দ্দশা। নামি দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

যতই ভাবে ততই তাহার মনে হয় এ পৃথিবীতে তাহার স্থান আর নাই। সঙ্গতিপন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া আট বৎসর বয়সে মাতৃহারা হইয়াছে, তারপর বিমাতার তত্ত্বাবধানে কত দুঃখকষ্টে দশবৎসর কাটাইয়া যেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখের অধিকারিণী হইল, অমনি কাল-ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিল। তারপর যে-শাস্তি লাভ করিল তাহা মরণ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। পতি তাহার প্রতি অনুরক্ত থাকিলেও তাঁহাকে পতি বলিবার বা আপনাকে তাঁহার স্ত্রী বলিবার অধিকার আর তাহার নাই। যদি এমন দুর্ব্বহ জীবন যাপন করিতেই হইবে তবে সে জন্মগ্রহণ করিল কেন? মাতার সহিত তাহার মৃত্যু হইল না কেন? কেন তাকেওর সহিত বিবাহ হইল? যখন প্রথম পীড়া হইল তখন সে পতির বুকে মরে নাই কেন? আপনার দুরদৃষ্টের কথা যখন জানিতে পারিল, তখনই বা সে মরিল না কেন? অসাধ্য রোগে যে ভুগিতেছে, অসম্ভব প্রেমের প্রত্যাশী যে, তাহার বাঁচিয়া থাকার আর কি প্রয়োজন আছে? আর রোগ যদি সারিয়াই যায় তবুও পতিকে না পাইলে সে তো বাঁচিতে পারিবে না, ভগ্নহৃদয় লইয়া মরিয়া যাইবে! মরণ! মরণ! মরণ ছাড়া তাহার আশা আর কোথাও নাই!

নামি অশ্রু মুছিবার চেষ্টা করিল না, অশ্রুজলের ভিতর দিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিল।

ওশিমার দিকে সহসা কালো কালো মেঘের আবির্ভাব হইতেছিল, আকাশের সুদূর প্রান্ত হইতে একটা অবর্ণনীয় কোলাহল জাগিয়া উঠিতেছিল। চকিতের মধ্যে বিপুল সাগরে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। একটা দম্‌কা বাতাস উঠিল। সেটা যেই বহিয়া গেল, অমনি কালো জলের মাঝে সহসা তুষারের মত ফেনপুঞ্জ প্রকাশিত হইল—পাগলা ঘোড়ার মত বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া ঢেউগুলি, নামি যে পাহাড়ের উপর বসিয়া ছিল, তাহার গায়ে আছড়াইয়া পড়িল। সাগামি সমুদ্রের বারিরাশি

ফেনিল হইয়া উঠিল, তরঙ্গগুলি উন্মত্ত উল্লাসে ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি মাতামাতি করিতে লাগিল!

জলের ছাট উপেক্ষা করিয়া নামি তখনো সমুদ্র দেখিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—ঐ সমুদ্রের তলে মৃত্যু। জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই হয়তো সুখের। নিরাশা লইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা নিরাকার ছায়ার মত পতির সঙ্গে নিয়ত বাস করা কি বাঞ্ছনীয় নয়? তিনি এখন পীত সমুদ্রে। হউক দূর—এই জলই তো সেখানেও বহিতেছে! সাগরের ফেনার মত আমি মিলাইয়া যাইব—আত্মা আমার তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাইবে!

কোমরবন্ধের ভাঁজে তাকেওর পত্রখানি সযত্নে রাখিয়া নামি দাঁড়াইয়া উঠিল। বাতাসে তাহার কেশপাশ খুলিয়া পড়িল।

আকাশের অন্তস্থল হইতে দীর্ঘনিশ্বাসের মত অবিরাম বাতাস বহিতেছিল। কষ্টে স্বষ্টে নামি দাঁড়াইল। উপরে মেঘের দল পরস্পরের পিছু পিছু দ্রুত ছুটিয়া চলিতেছে, সম্মুখে সাগর ক্রোধে তোলাপাড়া করিতেছে। সাকুরা পাহাড়ের উপর বাতাস গর্জ্জিতেছিল, দেবদারু গাছগুলি ক্রুদ্ধ অশ্বের কেশরের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। ঝড়ের চীৎকার, সাগরের গর্জ্জন, পাহাড়ের বিলাপ মিলিয়া মিশিয়া একটা বজ্রনিনাদে আকাশ ও পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

সময় আসিয়াছে! এই উপযুক্ত সময়! মা আমার হাত ধর! বাবা তোমার কন্যাকে ক্ষমা কর! আমার অসম্পূর্ণ জীবন স্বপ্নের মত মুছিয়া যাক!

কাষ্ঠপাদুকা খুলিয়া ফেলিয়া দুই হাতে পোশাক তুলিয়া ধরিয়া সে ফেনিল সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাতে কে চীৎকার করিয়া উঠিয়া তাহাকে দৃঢ় হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পোর্ট্ আর্থার

বাইশে নোভেম্বর জাপানী সেনা পোর্ট্ আর্থার দখল করিয়াছিল।

"মা! মা! ও মা!"

সংবাদপত্র হাতে লইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে চিজু চীৎকার করিয়া উঠিল।

"হয়েছে কি? অমনি করে চেঁচাতে হয়, ছি!"

মাতার ভর্ৎসনায় লজ্জায় চিজুর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। ঈষৎ হাসিয়া আবার গম্ভীর হইয়া সে কহিল—"মা চিজিওয়া মারা গেছে।"

"চিজিওয়া! চিজিওয়া মরেচে? কেমন করে? যুদ্ধে?"

"হ্যাঁ। খবরের কাগজে তার নাম রয়েচে। ঠিক হয়েছে!"

"ছি! ও কথা বলতে নেই—হাজার হোক, যুদ্ধে মরেচে সে! কিন্তু এত সাহস হল কি করে তার?"

চিজু কহিল—"তার পক্ষে মরাই ভালো হয়েছে।" কাতো গৃহিণী অল্পক্ষণ নীরব রহিয়া বলিলেন—"মরার পর কাঁদবার কেউ থাকবে না, এটা কি কম কষ্টের কথা চিজুসান?"

চিজু বিদ্রূপের স্বরে কহিল—"কাঁদবার লোকের ভাবনা কি? কাওয়াশিমা বুড়ী রয়েচে তো! হ্যাঁ, কাওয়াশিমা বলতে মনে পড়ল—ওতোয়োসান ও বাড়ী থেকে বিদায় হয়েচেন।"

"ঠিক জানিস?"—কথাটা শুনিয়া মাতা বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন।

"হ্যাঁ। কাল আরো কি গোলমাল হয়েছিল বুড়ীর সঙ্গে, সহ্য

করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেছে শুনলুম। ও বাড়ী ছেড়েচে, বেশ হয়েচে!"

"ওখানে বেশী দিন কেউ টি'কতে পারে বলে' তো বোধ হয় না।"

কাতোগৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, চিজু নীরব রহিল।

চিজিওয়া মরিয়াছিল। উপরোক্ত কথোপকথনের তিন সপ্তাহ পরে কাওয়াশিমার নিরানন্দ বাড়ীতে একখানা পত্র ও একখণ্ড মনুষ্য-অস্থি আসিয়া পৌঁছিল। অস্থিখণ্ড চিজিওয়ার; পত্র তাকেওর নিকট হইতে আসিয়াছিল।

সে লিখিয়াছিল—"পোর্ট্ আর্থার দখলের দুই দিন পরে সকল পোত ও পোতাশ্রয়গুলি নৌবিভাগের হস্তে অর্পিত হইবে স্থির ছিল—সেই উপলক্ষ্যে আমার জাহাজের অন্য কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত তীরে নামিয়াছিলাম। ভীষণ যুদ্ধের পরবর্ত্তী সে ভয়ানক দৃশ্য বর্ণনার অতীত! আমি একটা অস্থায়ী যুদ্ধ-হাঁসপাতালের সামনে দিয়া চলিয়াছিলাম। দেখিলাম কয়েকজন লোক ডুলিতে একটা মড়া বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। মড়ার গা' একখানা নীল কম্বলে এবং মুখ সাদা কাপড়ে ঢাকা। আচ্ছাদনের মধ্য দিয়া যেটুকু মুখ দেখা যাইতেছিল তাহা দেখিয়া আমার পরিচিত একজনের কথা মনে পড়িতেছিল—তাই নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। যখন শুনিলাম মৃতদেহ লেফটেন্যাণ্ট চিজিওয়ার, তখন আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

"তাহার মুখের আবরণ খুলিয়া দিলাম। দেখিলাম মুখ বিবর্ণ পাংশুল, দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেছে। ইতুশান কেল্লা দখল করিতে গিয়া সে গুলির ঘায়ে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। সকাল অবধি জ্ঞান ছিল, তারপর মরিয়াছে। শুনিলাম তার দলের লোক তাহাকে মোটেই পছন্দ করিত না; কিন্তু সে যুদ্ধ

লড়িয়াছে ভালো—চিংচৌ আক্রমণের সময় সে-ই লোকজন লইয়া উত্তর দ্বার ভাঙিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু অনেক সময়ই সে সৈনিকের অযোগ্য ব্যবহার করিত। সঙ্গে তার বিস্তর অর্থ ছিল। একবার পিংজুওতে সে নাকি কয়েকজন চীনার প্রতি ভারি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে—কড়া হুকুম অমান্য করিয়া তাহাদিগের অর্থ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। সে জন্য তাহার শাস্তি হইবারও কথা ছিল। সে যাই হোক, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হওয়াতে তাহার সে কলঙ্কের মোচন হইয়াছে।

"তুমি ত জানই সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে—সে জন্য তাহার সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার স্মৃতির বিরুদ্ধে আমার বলিবার কিছু নাই। আর যখন ভাবি কতদিন আমরা একত্র সহোদরের মত কাটাইয়াছি, তখন বাস্তবিকই বেচারার জন্য কষ্ট হয়। তাহার দেহ ভস্মীভূত করিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম—তাই এক খণ্ড অস্থি পাঠাইতেছি। যথাবিধি সমাহিত করিয়ো।"

পোর্ট্ আর্থারে তাকেও যে কেবল ইহাই দেখিয়াছিল তা নয়। আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইচ্ছা করিয়া পত্রে সে-বিষয়ের উল্লেখ করে নাই।

চিজিওয়ার মৃতদেহ যেদিন মিলিয়াছিল সেদিন জেটিতে ফিরিতে তাকেওর বিলম্ব হইয়া গেল।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল। সঙীন উঠাইয়া শাস্ত্রী দাঁড়াইয়া আছে, অশ্বারোহী সেনাপতি ঘুরিয়া ফিরিতেছে, নিম্নে কর্ম্মচারীবৃন্দ উপর-ওয়ালার নিকট হুকুম গ্রহণ করিতেছে, চীনারা বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাঁবেদারেরা হুকুম তামিল করিবার জন্য ঘোরাঘুরি করিতেছে। এক স্থানে কয়েকজন কুলি একটা প্রকাণ্ড আগুন জ্বালাইতেছিল, তাকেও অবশেষে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল।

তাহাদের মধ্যে একজন কহিল—বেজায় শীত! বাড়ী থাকলে মাছপোড়ার সঙ্গে দিব্যি এক পাত্তর খাওয়া যেত। কিচি, তোর গায়ে তো বেড়ে জিনিস দেখচি!

কিচি একটি চমৎকার বেগুনে রঙের সাটিনের তুলাভরা কোর্ত্তা পরিয়া ছিল। সম্ভবত সেটি সে কাহারো নিকট হইতে হাতাইয়াছে।

কিচি উত্তর করিল—এ ত কি! একবার গেনের দিকে দেখ্। একটা লোমের কোর্ত্তা গায়ে দিয়েচে, ওর দাম চারশো টাকার কম নয়।

প্রথম কুলি কহিল—অমন বরাত না হলে কি ওর হাত থেকে শীকার কখনো ফসকায় না, ওর গায়ে বন্দুকের গুলি কখনো লাগে না, কিছু না করেই ও বকসিস পায়! আমার দিকে দেখ, এই পাতলা ধুরধুড়ে জামা। পোড়া অদৃষ্ট আমার! তাইলিয়েনওয়ানে সব খোয়া গেল। শীগ্‌গিরই একটা কিছু জোগাড় করতে হবে।

অপর একজন কহিল—সাবধান ভাই! আজ বিকেলে একটা বাড়ীতে ঢুকেছিলুম—হঠাৎ একটা বাক্সর পিছন থেকে এক টিকিধারী খোলা তরোয়াল হাতে লাফিয়ে বেরুল। সে ভেবেছিল আমি তাকে খুন করতে যাচ্ছিলুম, সত্যি কথা বলতে কি আমিই তার ভয়ে প্রায় মরবার দাখিল হয়েছিলুম! ভাগ্যে আমাদের সৈন্য এসে পড়ে' বেটাকে সাবাড় করে দিলে! নইলে যমের বাড়ী পৌছে দিয়েছিল আর কি!

পোর্ট্ আর্থার দখলের পর দু এক দিন মাত্র হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাড়ীর মধ্যে লুক্কায়িত বহু পলাতক চীনা সৈনিক জাপানীদিগকে বাধা দেওয়ার অপরাধে নিহত হইয়াছে।

সাধারণ সৈনিকদের কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে তাকেও জেটির

দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে আলোকের সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে, লোকচলাচলও বিরল হইয়াছে। একধারে শেলাখানার দীর্ঘ দেওয়াল ভূমির উপর কৃষ্ণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে, অন্য দিকে ভূমি ঘ্রাণ করিতে করিতে ধাবমান শীর্ণদেহ কুকুরের উপর রাস্তার ম্লান অস্পষ্ট আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

অন্ধকারে চলিতে চলিতে প্রায় পঞ্চাশ গজ সম্মুখে তাকেও দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সে বেশ বুঝিল, তাহারা কর্ম্মচারী। একজন বলিষ্ঠ স্থূলস্কন্ধ, অপরটি পাতলা ছিপছিপে। তাহারা কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইতেছিল। সহসা তাকেও লক্ষ্য করিল, কে একজন চুপে চুপে তাহাদের অনুগমন করিতেছে। দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা অসম্ভব রকম দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল না। হঠাৎ সেই লোকটা এক পদ অগ্রসর হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া আর এক পদ অগ্রসর হইল—বোধ হইল সে যেন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। এই বার মূর্ত্তিটা দুইটা বাড়ীর মাঝামাঝি একটা আলোকিত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল— লোকটা চীনা। ঠিক সেই সময়ে তাহার হাতে একটা কি ঝকমক করিয়া উঠিল। তাকেও উত্তেজিত হইয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল।

সম্মুখের লোক দুইজন একবারে পথের শেষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময় কালো মূর্ত্তিটা অন্ধকার হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া গেল। ভীত হইয়া তাকেও সম্মুখে ছুটিল। চীনাটা তাহাদের প্রায় দশ গজ তফাতে গিয়া উপস্থিত হইয়া নিমেষমধ্যে হাত তুলিয়া এক গুলিতে পাতলা কর্ম্মচারীটিকে ভূপাতিত করিল। অপর কর্ম্মচারীকেও সে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় তিনি হঠাৎ ফিরিলেন, এবং ঠিক সেই সময়ে তাকেও

উপস্থিত হইয়া খুনেটার ডান বাহুতে কঠিন আঘাত করিল। পিস্তলটা ভূমিতে পড়িয়া গেল। ব্যর্থকাম ক্রুদ্ধ খুনেটা ফিরিয়া তাকেওকে আক্রমণ করিল। দুজনে তখন হাতাহাতি বাধিয়া গেল। বলিষ্ঠ কর্ম্মচারিটি তাকেওকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। একদল জাপানী সেনা শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহারা খুনেটাকে বাঁধিয়া ফেলিল। তাকেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে স্থূলস্কন্ধ কর্ম্মচারীর দিকে চাহিল, তিনিও তাহার দিকে ফিরিলেন।

রাস্তার আলো কর্ম্মচারীর মুখের উপর পড়িল, তিনি আর কেহ নন—লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল কাতাওকা। তাকেও কহিল—আপনি!

সেনাপতিও বিস্মিত হইয়া কহিলেন—তুমি!

তাকেও নামির পিতার প্রাণরক্ষা করিয়াছে! নামির নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছিল, তখন ইকুর আনন্দ আর ধরে না। সে কহিল—"আহা তাঁরই উপযুক্ত কাজ হয়েচে! শীগ্‌গির করে সেরে ওঠ দিদিমণি।"

নামি একটু বিষাদের হাসি হাসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাকেওর প্রত্যাবর্ত্তন

যুদ্ধে বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল, যুদ্ধেই বৎসরের অবসান হইল।

প্রথম দুই মাসের মধ্যে উই-হাই-উই দখল ও চীনা রণপোত-বাহিনী ধ্বংস হইয়া গেল। মার্চ মাসে জাপানী সেনা বন্যার মত শত্রুকে সম্মুখ হইতে ভাসাইয়া লইয়া গেল—তাহাদের চিহ্নমাত্র রাখিল না। পর মাসে সন্ধিদূত জাপানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মে

মাসের শেষে জাপান-সম্রাট মহাসমারোহে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

পোর্ট আর্থারে চিজিওয়ার দেহভস্ম সমাহিত করিয়া এবং জেনারেল কাতাওকার জীবন রক্ষা করিয়া তাকেও উই-হাই-উই দখলে যোগদান করিয়াছিল। জুনের প্রারম্ভে তাহার জাহাজ য়োকোস্থকা বন্দরে ফিরিয়া আসিল। তাকেও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এক বৎসরের অধিক হইল সে ক্রোধবশে মাতার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া গেছে—তাকেওর মনও কতকটা কোমল হইয়া আসিয়াছে। সাসেবো হাঁসপাতালে বর্ষার দিনে, উই-হাই-উই বন্দরে দারুণ শীতের রাত্রে, তাহার গৃহহারা অন্তঃকরণ তোকিওর পুরাতন বাড়ীতে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

বাড়ী আসিয়া তাকেও কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল না, কেবল দেখিল যে-পরিচারিকাটি সদর দরজার কাছে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল সে নূতন লোক। মাতার শরীরের আয়তন কিছু-মাত্র কমে নাই, বাতে তিনি শয্যাশায়িনী। তাজাকি প্রত্যহ আসিয়া পূর্ব্বেকার মতই তাহার ছোট কামরায় বসিয়া সাংসারিক হিসাব পত্র লেখে। সবই ঠিক আছে, কোনো পরিবর্ত্তন নাই। অথচ এমন কিছুই তাকেও খুঁজিয়া পাইল না, যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া মনে আনন্দ পাইতে পারে। বহুদিনের পর মাতার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। নিজের বাড়ীতে বেশ আরাম করিয়া স্নান করিয়া পুরু কোমল আসনে বসিয়া সে তাহার বিশেষ প্রিয় ব্যঞ্জন খাইয়াছে, ও এক্ষণে নরম বালিস মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে তবু তাহার ঘুম আসিতেছিল না। ঘড়িতে একটা বাজিল, দুইটা বাজিল, তবু তাহার চোখে ঘুম নাই, হৃদয়ের ভারেরও কোনো লাঘব হইতেছিল না।

এক বৎসরে মাতাপুত্রের মনোমালিন্য কাটিয়া গিয়াছে—অন্তত দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছিল। মাতা অবশ্য পুত্রকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিলেন, পুত্রও তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু উভয়েই প্রথম সাক্ষাতেই লক্ষ্য করিল যে তাহাদের মধ্যে হৃদয়ের যোগ কোথাও নাই। পুত্র মাতাকে নামি সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না, মাতাও তাহার বিষয়ে কিছু বলিলেন না—পুত্রের জানিবার ইচ্ছা ছিল না বা মাতা যে জানিতেন না এমন নয়; কিন্তু তাহারা উভয়ে জানিত যে, সে-আলোচনায় বিপদের সম্ভাবনা; তাই এমন হইল। তাহারা উভয়েই লক্ষ্য করিতেছিল যে প্রত্যেকে ঐ আলোচনাটি এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; তাই কথাবার্ত্তা থামিয়া গেলেই পাছে অপ্রীতিকর আলোচনাটা জাগিয়া উঠে, তাই ভাবিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

নামিকে স্মরণ করিবার জন্য বিশেষ কোনো আলোচনার অপেক্ষা ছিল না। পুরাতন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তাকেও দেখিল, সকল জিনিসই তাহাকে সেই এক নামির কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাহার অন্তর নামির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে এখন কোথায়? সে কি তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের কথা শুনিয়াছে? প্রেম দূরত্বের ব্যবধান জানে না। কিন্তু এখন নামির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে, তাই শ্বশুরালয় এক ক্রোশের পথ মাত্র হইলেও, তাহাই তাকেওর নিকট গ্রহতারকার মত সুদূর বলিয়া বোধ হইতেছিল। নামির মাসী-মাতার নিকট গিয়াও নামির কথা জিজ্ঞাসা করিবার জো নাই। গত বৎসর মে মাসে জুসি গিয়া সে যখন তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, তখন সে তো স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সেই বিচ্ছেদ তাহাদের চিরবিচ্ছেদ হইবে। বাড়ীর ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া নামি বলিয়াছিল—শীগ্‌গির ফিরে এস! সে ধ্বনি

এখনো তাহার কানে বাজিতেছে, কিন্তু এখন সে কাহার নিকট গিয়া বলিবে—আমি ফিরে এসেছি ?

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে একদিন রোকোসুকার পথে জুসিতে অবতরণ করিয়া তাকেও উদ্যানবাটিকা অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখিল সম্মুখের ফটকটি বন্ধ রহিয়াছে। বাড়ীর মালিক তোকিও গিয়াছে ভাবিয়া সে ঘুরিয়া বাড়ীর পশ্চাতে গেল। উদ্যানে বৃদ্ধ ভৃত্য একাকী আগাছা তুলিতেছিল।

পদশব্দ শুনিয়া বৃদ্ধ মুখ ফিরাইল। আগন্তুককে চিনিতে পারিয়া সবিস্ময় সম্ভ্রমের সহিত তাহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল—"নমস্কার হই, কবে ফিরলেন আপনি ?"

তাকেও কহিল—"এই দিন কতক হল। ভালো আছ মোহেই ?"

বৃদ্ধ কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভালোই আছি আপনাদের আশীর্ব্বাদে।"

তাকেও জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি এখানে একলা রয়েচ ?"

"ব্যারনেস—না দিদিমণি—এই যাঁর অসুখ হয়েছিল, তিনি ইকুর সঙ্গে গত মাসের শেষ পর্য্যন্ত এখানেই ছিলেন। তখন থেকে আমি একলাই রয়েচি।"

তাকেও নিজের মনে বলিল—"গত মাসে ফিরেছে ? তাহলে এখন সে তোকিওতেই আছে !"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"কর্ত্তাবাবু চীন থেকে ফেরবার আগেই তিনি তোকিও গিয়েছিলেন। তারপর তিনি কর্ত্তার সঙ্গে কিওতো গিয়েছিলেন, এখনো ফেরেন নি বোধ হয়।"

তাকেও নিজের মনে বলিল—"কিওতো ? তাহলে সে ভালো আছে নিশ্চয়।" তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"কবে কিওতো গেলেন ?"

"এই হপ্তাখানেক"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সহসা থামিয়া গেল। ভাবিল এতটা বলা ঠিক নয়। তাকেও বুঝিতে পারিল, বৃদ্ধ ভৃত্যের

মনের মাঝে কোন্ চিন্তা উদিত হইতেছে, তাই তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ তাহারা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাকেওর অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধের মনে দুঃখ হইল, সে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"দোর খুলে দি। ভেতরে বসুন, একটু চা খান।"

তাকেও কহিল—"না না ব্যস্ত হোয়ো না। য়োকোসুকায় ফিরছিলুম তাই একবার দেখে গেলুম।"

পরিচিত উদ্যানটি দেখিবার জন্য তাকেও মুখ ফিরাইল। উদ্যান-রক্ষক ছিল বলিয়া বাগানে বনজঙ্গল হয় নাই। বাড়ীর সমস্ত দ্বার বন্ধ, চৌবাচ্চা জলশূন্য। বৃক্ষগুলি পত্রবহুল হইয়া উঠিয়াছে। মাটির উপর পাকা কুল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। শস্পাচ্ছাদিত ভূমির উপর বৎসরের শেষ গোলাপ তার অন্তিম নিশ্বাসের মৃদু সুরভিতে উদ্যান পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই। কেবল দেবদারুগাছ হইতে পতঙ্গের কর্কশ চীৎকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

তাকেও বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চিন্তাভারাক্রান্ত মনে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে আবার দক্ষিণে যাইবার হুকুম আসিল।

দুই সপ্তাহ সে বাড়ীতে ছিল—কিন্তু সে-সময় যুদ্ধ-জয়ের আনন্দ-উৎসবে অতিবাহিত হয় নাই। দূরে থাকিয়া সে মনে করিত বাড়ীর মত স্থান পৃথিবীতে কোথাও নাই, কিন্তু এখন সেখানে আসিয়া শত চেষ্টা করিয়াও অন্তরের শূন্যতা কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারিল না।

মাতা তার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখনি তাহারা কথা কহে, তাকেওর মনে হয়, তাহাদের মধ্যে যেন একটা দেওয়ালের ব্যবধান রহিয়াছে। সে-ব্যবধান কিছুতেই ঘুচিতেছে না।

য়োকোসুকা হইতে জাহাজে যাত্রা করিবার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে যাইবার গাড়ী ধরিতে না পারিয়া তাকেও কুরে হইতে জাহাজে উঠিবে স্থির করিল। দসই জুন তারিখে সে একাকী তোকাই-দো রেলপথে যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চকিতের দেখা

উজির মন্দির হইতে তিন জন লোক বাহির হইয়া আসিল। পঞ্চাশোর্দ্ধবয়স্ক একজন স্থূলাকার ভদ্রলোক য়ুরোপীয় পোশাকে সজ্জিত; তাঁহার হাতে এক গাছা সোনা-বাঁধানো বেতের লাঠি। প্রায় বিংশবর্ষীয়া একটি রমণী, হাতে তাঁর একটি কালো ছাতা। একটি বর্ষীয়সী পরিচারিকা, তাহার হাতে একটি ছোট থলি।

তাঁহাদিগকে বাহির হইতে দেখিয়া তিন জন লোক তিন খানি রিক্‌স টানিয়া আনিয়া ফটকের নিকট হাজির হইল। তাহারা তাঁহাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। রমণীর দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কহিলেন, "চমৎকার দিন হয়েছে। একটু হাঁটবে কি মা?"

"বেশ তো।"

পরিচারিকা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁপিয়ে যাবে না দিদিমণি?"

রমণী কহিল—"না না হাঁপাবো কেন? হাঁটি না একটুখানি।"

"তাহলে চল আস্তে আস্তে যাই, দরকার হ'লেই রিক্‌স চড়া যাবে।"

তিন জনে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, রিক্‌স তিন খানা পশ্চাতে চলিল। এ তিন ব্যক্তি আর কেহ নয়, জেনারেল কাতাওকা,

নামি ও ইকু। তাঁহারা গতকল্য নারা হইতে এখানে আসিয়াছিলেন, এখন উৎসু যাইবার জন্য য্যামাশিনা ষ্টেসনের দিকে চলিয়াছেন।

জেনারেল গত মে মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এক দিন গোপনে তিনি কন্যার চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার দুই দিন পরেই নামি ও ইকুকে লইয়া কিওতো যাত্রা করিলেন। নদীর ধারে একটি কোলাহলবর্জ্জিত নিস্তব্ধ হোটেলে আড্ডা গাড়িয়া সৈনিকের পোশাক ছাড়িয়া ফেলিয়া, কয়েকদিন ধরিয়া নামিকে লইয়া তিনি বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। সভাসমিতির সমস্ত নিমন্ত্রন প্রত্যাখ্যান করিয়া, জগতের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া, এ কয় দিন তিনি একান্ত নামির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

চা তুলিবার ঠিক সময় অতিবাহিত হইয়া গেলেও বাতাসে মাঝে মাঝে শুষ্ক চাএর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল! চাএর ক্ষেতের মাঝে মাঝে গোধুমের ক্ষেতগুলি হরিদ্রাবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষণে ক্ষণে কাস্তের খস্ খস্ শব্দ শুনা যাইতেছিল। দূরে য্যামাতোর পাহাড়গুলি গ্রীষ্মের তরল কুহেলি-সমাচ্ছন্ন। বহুদূরে নৌকার শুভ্র পাল গোধুমের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া উঠিয়া উজি নদীর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কাকের আলস্যবিজড়িত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল। মাথার উপর আকাশে একখানা পাণ্ডুরবর্ণ মেঘ স্থির হইয়া ভাসিতেছিল।

নামি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সেই সময় বাম দিকের একটা পথ হইতে এক কৃষক ও তাহার পত্নী কথোপকথন করিতে করিতে বাহির হইল। দ্বিপ্রহরের আহারের পর তাহারা কাজে চলিয়াছে। পুরুষটির কোমরবন্ধে একখানি কাস্তে গোঁজা, স্ত্রীলোকটির দাঁত কৃষ্ণবর্ণ, তাহার মাথায় একখণ্ড শাদা কাপড় জড়ানো। তাহার হাতে একটি প্রকাণ্ড চাএর কেটলি।

নামিদের দল দেখিবামাত্র সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল। উভয়েই ফিরিয়া চাহিল। স্ত্রীলোকটি মৃদু হাস্য করিতেছিল, তাহার রঞ্জিত দাঁতগুলি দেখা যাইতেছিল। কথা কহিতে কহিতে তাহারা একটা মেঠো রাস্তায় গিয়া পড়িল। সেখানে বন্য কাঁটাগাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

নামির দৃষ্টি তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। কৃষকের থালার ন্যায় প্রকাণ্ড গোল খড়ের টুপি ও কৃষক-পত্নীর শ্বেত মস্তকাবরণ ক্রমশ গোধূম-ক্ষেত্রের হরিদ্রাবর্ণের মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর শোনা গেল মনের আনন্দে কৃষক গান ধরিয়াছে।

নামি তাহার বিষাদমাখা চোখ দুটি ভূমির উপর স্থাপিত করিল।

জেনারেল তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"তুমি কি হাঁপিয়ে উঠেছ মা?" কন্যার হাত তিনি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

চলিতে চলিতে জেনারেল নামির সহিত কথা কহিতেছিলেন।

"সময় যেন উড়ে চলেছে। তোমার কি মনে পড়ে মা যখন তুমি ছোট ছিলে, তোমাকে আমি পিঠে করে নিয়ে বেড়াতুম, আর তুমি পা ছুড়তে। তোমার বয়েস তখন নিশ্চয়ই পাঁচ ছ' বছর হয়েছিল।"

ইকু বলিয়া উঠিল—"আমার মনে পড়ে, কর্ত্তাবাবু তোমায় যখন পিঠে নিতেন, তখন ছোট দিদিও ওঁর পিঠে চড়বার জন্যে কি রকম কান্নাকাটি আরম্ভ করতেন! এখনো তিনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, আমাদের সঙ্গে থাকলে কি মজাটাই হোত!"

নামি একটু ম্লান হাসি হাসিল।

জেনারেল কহিলেন—"কে কোমা? তার জন্তে আমরা অনেক ভালো ভালো জিনিস নিয়ে যাব'খন। কিন্তু কোমার চেয়ে চিজুসানই আসতে চেয়েছিল বেশী, না মা?"

ইকু পুনরায় বলিতে লাগিল—"আমারো তাই মনে হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে থাকলে খুব আমোদ হোত! কর্ত্তাবাবু, আপনাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। যে-নদীটা আমরা এই মাত্তর পেরুলুম ওটা কি উজি নদী? ঐ নদীটাই ত জোনাকি পোকার জন্তে বিখ্যাত? আর ওখানেই ত কোমাজাওয়া তার প্রেয়সী মিয়ুকির দেখা পেয়েছিল?"

জেনারেল সহাস্তে কহিলেন—"আমাদের ইকু কম নয়—ওর আর কিছু জানতে বাকি নেই!

"কালে কালে কত জিনিসই বদলাচ্চে। আমি যখন ছোট ছিলুম তখন ওসাকা থেকে কিওতো যেতে হলে নৌকোয় গাদাগাদি করে যেতে হোত। প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হয়ে যেত! আমার যখন কুড়ি বছর বয়েস তখন এক মজার ব্যাপার হয়েছিল। একবার একটা জরুরি কাজে ওসাকা যেতে হয়েছিল, পথে এসে দেখি ট্যাঁকে একটিও টাকা নেই। কি আর করি, খালি পায়ে রাত্তির বেলায় নদীর ধার দিয়ে ওসাকা পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা ছুটতে ছুটতে গেলুম। হা, হা, হা!

"গরম বোধ হচ্ছে। নামি মা! তোমার আর চলে' কাজ নেই। গাড়ীতে ওঠো।"

ইকু রিকস্ওয়ালাদের ডাক দিল। তিনজনে রিকস্ চড়িয়া ধীরে ধীরে চা ও গোধুম-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া য়্যামাশিনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পিতার মাথায় শুভ্রকেশ দেখিয়া নামির মনে নানাপ্রকার

চিন্তার উদয় হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে, জগতের সমস্ত আশা ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া অদূরবর্ত্তী মৃত্যুর অপেক্ষায় সে বসিয়া আছে—তাহার ভাগ্য কত মন্দ! কিন্তু এরূপ মন্দভাগ্য কন্যার যিনি পিতা তাঁহার অবস্থা কী শোচনীয়! তাহার প্রতি পিতার অসীম স্নেহ ভালোবাসার সে কী প্রতিদান দিবে? মনে মনে তাহার বিগত বাল্যজীবনে ফিরিয়া গিয়া, জগতের কথা ভুলিয়া, পিতার বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত আর কিছুই সে করিতে পারে না! সেই জন্য সে শিশুর মত আগ্রহে নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতেছিল। কিওতোয় যখন সে রেশমের কাপড় খরিদ করিতেছিল, তখন সে জানিত, উহা তাহার কোনো কাজেই লাগিবে না; তবুও সে খুব রংচংএ কাপড়ই বাছিয়া কিনিল—তাহার ভগ্নী সেগুলি পাইলে তাহাকে মনে রাখিবে বলিয়া।

পিতার দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেও নামি তাকেওর কথা একমুহূর্ত্তও বিস্মৃত হয় নাই। তাহার কোনো সংবাদই সে পায় নাই। পোর্ট্ আর্থারে তাকেও পিতার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল কেবল এই সংবাদ পাইয়াছিল। তাহার কত ভাবনা হইত। স্বপ্নে সে তাহার দেখা পাইত, কিন্তু সে যে কোথায় তাহার কিছুই সে জানিত না। তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইত, জীবনে কেবল আর একবার দেখিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু হায়! সে সাধ তাহার অপূর্ণই রহিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার সেই কৃষক-দম্পতির কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহারা কী নিবিড় সুখে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছিল! জীর্ণ চীর পরিয়া তাহারা কত সুখী, তাহাদের কী সৌভাগ্য! আর বহুমূল্য রেশমের পোশাক পরিয়া সে—!

চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। অশ্রুরোধ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে ভয়ানক কাশিতে লাগিল।

কাশির শব্দে চিন্তিত হইয়া জেনারেল ফিরিয়া চাহিলেন।

অমনি অশ্রুর মধ্যে হাসি ফুটাইয়া নামি কহিল—"কিছু নয়, সেরে গেছে।"

য়্যামাশিনায় তাহারা একখানা পূর্ব্বদিক্‌গামী ট্রেনে চাপিল। প্রথম শ্রেণীর কামরায় কেবল তাহারা তিন জন। নামি খোলা জানালার ধারে বসিল, তাহার পিতা তাহার সম্মুখে বসিয়া কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

অনতিকাল পরেই একখানা কোবের গাড়ী পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া তাহাদের গাড়ীর পাসে থামিল। অন্য দিকে ট্রেনের দরজা খুলিবার শব্দ ও কুলিদের 'য়্যামাশিনা' 'য়্যামাশিনা' বলিয়া চীৎকার হইতেছে, এমন সময় নামিদের ট্রেনের ইঞ্জিন বাঁশি বাজাইয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। জানালা হইতে নামি পাশের ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল। যেই একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে আসিয়াছে অমনি দেখিল—একটি যুবক হস্তে কপোল রাখিয়া বসিয়া আছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের চোখে চোখে সাক্ষাৎ হইল। নামি একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল।

যুবক 'নামি-সান' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—সে তাকেও।

ট্রেন চলিয়া যাইতেছে। নামি উন্মাদিনীর মত লাফাইয়া উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া যুবকের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার বেগুনে রঙের রুমালখানি নাড়িতে লাগিল।

'পড়ে যাবেন যে দিদিমণি!'—বলিয়া ব্যস্ত চকিত হইয়া ইকু তাহার আস্তিন চাপিয়া ধরিল।

জেনারেল তাহা দেখিয়া কাগজ হাতে লইয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইলেন।

ট্রেন দুইখানার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছিল। নামি

জানালা দিয়া আরও ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, তাকেও অধীরভাবে রুমাল নাড়িতেছে, ও কি বলিতেছে। তাহার কথা নামির কানে পৌঁছিল না। সহসা ট্রেনখানা একটি পাহাড়ের পাশ দিয়া বাঁকিয়া গেল। এখন উভয় দিকে কেবল তৃণাচ্ছাদিত ঢালু জমি। পশ্চাতে কাপড় ছেঁড়ার মত একটা ফ্যাশ্ শব্দ হইল। তাকেওর ট্রেন পশ্চিমে যাত্রা করিল।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নামি পিতার কোলের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চিরবিদায়

সাতই জুলাই সন্ধ্যাকালে জেনারেল কাতাওকার গৃহে অনেক লোক সমবেত হইয়াছেন। সকলেই চাপা গলায় কথা কহিতেছিলেন, কারণ তাঁহার কন্যা নামির মৃত্যুকাল উপস্থিত।

গতমাসের শেষে যখন নামি ও তাহার পিতা হঠাৎ কিওতো হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন সকলেই দেখিল নামির অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছে। চিকিৎসক বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে কেবল যে তাহার স্বাস্থ্যের অবনতি হইয়াছে তাহা নয়, তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। সেই সময় হইতে কাতাওকার গৃহে গভীর রাত্রিতেও বাতি জ্বলিত, চিকিৎসকেরা অহরহ আনাগোনা করিতেন। কাতাওকা-গৃহিণী গ্রীষ্মাবাসে যাইবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন, আপাতত সে সংকল্প তাঁহাকে স্থগিত রাখিতে হইল।

সুচিকিৎসা, দিবারাত্র ইকুর অশ্রুসিক্ত সেবা ও প্রার্থনা, কিছুতেই কিছু হইল না—নামির অবস্থা ক্রমশ মন্দ হইতে লাগিল। উপরি উপরি কয়েকবার রক্তবমন হইল। যেদিন রক্তবমন হয় সেদিন সে আধঘুমন্ত অবস্থায় আপনার মনে কত কি বকে। দিন দিন সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। তাহাকে কাশিতে শুনিয়া যখন তাহার পিতার ঘুম ভাঙিয়া যাইত, তিনি উঠিয়া কন্যাকে দেখিতে আসিতেন, নামি অমনি মুখে ম্লান হাসি ফুটাইয়া পরিষ্কার গলায় কথা বলিত—তাহার যে নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে সে কথা গোপন করিতে চেষ্টা করিত। আধঘুমন্ত অবস্থায় সে গুন গুন করিয়া কেবলই তাকেওর নাম উচ্চারণ করিত।

চিকিৎসক যে-দিনটিকে ভয় করিতেছিলেন সেই দিন নিকট হইয়া আসিতেছিল। ঘরে ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে। কেহই উচ্চ কণ্ঠে কথা কহিতেছে না, সমস্ত বাড়ী সমাধিভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ। পীড়িতার ঘর হইতে দুইটি মহিলা বাহির হইয়া আসিলেন—একজন কাতো-গৃহিণী ও অপরটি একটি বৃদ্ধা। এই বৃদ্ধাই জুসিতে সমুদ্রে লম্ফ-প্রদানে উদ্যতা নামিকে বাধা দিয়াছিলেন। গতবৎসরের শরৎকালের পর আর তিনি নামিকে দেখেন নাই। নামির বিশেষ অনুরোধে আজ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছে।

"আপনার দয়ায় একবার তার প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। আপনার কাছে যে আমরা কত কৃতজ্ঞ তা আর কী বল্‌ব! নামি আর একবার আপনাকে দেখতে চেয়েছিল। আপনি এসেচেন দেখে নিশ্চয়ই সে খুব খুসী হয়েচে।" কাতোগৃহিণী আর কথা কহিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কি যে বলিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তিনি কোথায়—ওঁর স্বামী ?"

"শুনচি তিনি ফর্মোসায়।"

"ফর্মোসা !"—বৃদ্ধা আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

কাতোগৃহিণী অনেক কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া কহিলেন—"নামি সদাই তাঁর কথা ভাবচে, কাছাকাছি হলে তাঁকে আমরা ডাকিয়ে পাঠাতুম, একবার ওদের শেষ দেখাটা হয়ে যেত! কিন্তু সে এখন ফর্মোসায় ; শুধু তাই নয়, যুদ্ধজাহাজে রয়েচে—"

এমন সময় কাতাওকা-গৃহিণী প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে চিজু আসিয়া মাতাকে কি বলিল।

প্রশস্ত ঘরটিতে বাতির ম্লান আলো পড়িয়াছিল। তুষার-শুভ্র শয্যার উপর নামি চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়া ছিল, সেই দুই বৎসর ধরিয়া ভুগিতেছে। এখন তাহাকে দেখিলে ছায়া বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার পাণ্ডুর মুখ প্রায় স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কেশ পূর্ব্বেরই মত মসৃণ রহিয়াছে। শয্যার পার্শ্বে ধাত্রী বসিয়া সুশীতল মদ্যে তাহার ওষ্ঠ ভিজাইয়া দিতেছিল। ইকুর চক্ষু কোটরগত, মুখ রক্তহীন পাণ্ডুর। অন্য একজন ধাত্রী নামির বক্ষদেশ মালিশ করিতেছিল। ঘর নিস্তব্ধ—কেবল নামির নিশ্বাস ফেলিবার শব্দ শুনা যাইতেছিল।

সহসা সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, চোখ খুলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মাসী কোথায় ?"

"এই যে মা"—বলিয়া কাতোগৃহিণী চেয়ারখানা শয্যার নিকট টানিয়া লইয়া নামিকে কহিলেন—"একটু ঘুম হোল কি ? কি বল্‌চ ? আচ্ছা।" ধাত্রী ও ইকুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমরা একবার বাইরে যাও তো বাছা।" তাহারা চলিয়া গেলে তিনি শয্যার আরো নিকটে চেয়ার টানিয়া লইলেন। নামির কপালের উপর হইতে ধীরে ধীরে চুলগুলি সরাইয়া দিয়া তাঁহার ম্লান বিষণ্ণ দুটি বোনঝির উপর

স্থাপিত করিলেন। নামিও মাসীমাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বালিসের তল হইতে কম্পিত হস্তে নামি একখানি খামে-মোড়া চিঠি বাহির করিল। ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "এখানা—আমি—মরে'—গেলে—তাঁকে—দিও।" কাতোগৃহিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে পত্রখানা বক্ষের কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া কহিলেন—"কিছু ভেবো না মা। আমি নিজের হাতে তাকেওকে দেবো।"

"কিন্তু এই—এই আংটি—"

নামি তাহার বাম হাতখানি মাসীমাতার জানুর উপর রাখিল। সেই হাতের একটি অঙ্গুলিতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় দীপ্তি পাইতেছিল। সেটি তাকেও বিবাহের সময় নামিকে দিয়াছিল। স্বামীগৃহ হইতে বিতাড়িত হওয়ার সময় সকল জিনিসই সে শ্বশুরালয়ে ফিরাইয়া দিয়াছিল, ফিরাইয়া দিতে পারে নাই কেবল এই অঙ্গুরীয়টি। নামি কহিল, "এটি—আমি—সঙ্গে—নিয়ে—যাবো।" মাসীমাতা চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘাড় নাড়িলেন। নামি চক্ষু মুদিল। কিছুক্ষণ পরে আবার চক্ষু মেলিয়া নামি কহিল, "তিনি—কি—করচেন—তাই—ভাবচি।"

"তাকেও-সান ফর্মোসায় পৌঁছে কাজ করচেন। নিশ্চয়ই সদাই আমাদের কথা ভাবচেন। তোমার বাবা বলচেন, সম্ভব হয়ত তাঁকে ডাকিয়ে পাঠানো হবে। নিশ্চয় বলচি নামি মা! আমি তাঁকে তোমার কথা বল্‌ব, এই চিঠিখানাও দেবো তাঁর হাতে।"

নামির অধরে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। পরক্ষণেই তাহার রক্তহীন কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল, বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল, চক্ষু দিয়া উষ্ণ অশ্রু গড়াইতে লাগিল। যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া সে বলিয়া উঠিল—"উঃ বুক গেল! বড় ব্যথা!"

কপাল কুঞ্চিত করিয়া বক্ষদেশ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বেদনায় সে ছটফট করিতে লাগিল। কাতোগৃহিণী ডাক্তার ডাকিবার জন্য উঠিতেছিলেন, এমন সময় নামি শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল, তারপর কাশিতে কাশিতে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

চিকিৎসক ও অন্যান্য সকলে ঘরের মধ্যে আসিলেন। ধাত্রীর সাহায্যে চিকিৎসক নামিকে কতকটা সুস্থ করিলেন। শয্যার নিকটের একটা জানালা খুলিয়া দেওয়া হইল।

স্নিগ্ধ নিশীথ সমীরণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে সেইমাত্র চাঁদ উঠিয়াছিল। চাঁদের আলো বৃক্ষ-শাখার ফাঁকে ফাঁকে রূপার মায়া ছড়াইতেছিল।

জেনারেল, তাঁহার পত্নী, কাতোগৃহিণী, চিজু, কোমা ও ইকু—সকলেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া। ধীর সমীরণ নামির কেশগুচ্ছ কম্পিত করিতেছিল—সে মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া ছিল। চিকিৎসক তাহার নাড়ী টিপিয়া ধরিয়া এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। ধাত্রী একজন তাঁহার নিকটে বাতি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বাতির আলো মিটমিট করিতেছিল।

এইরূপে দশ মিনিট—পনর মিনিট অতিবাহিত হইল। ঘরের মধ্যে ঈষৎ একটু নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল, তারপর নামির অধর কম্পিত হইল। চিকিৎসক তাহার মুখে এক চামচ মদ ঢালিয়া দিলেন। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নামি বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—"চল চল। ফিরে চল। এই যে মা আমরা আসচি। ও, এখনো এখানে?" নামি চক্ষু মেলিল।

উদ্যানের উপরে চাঁদ উঠিয়া মায়াময় আলোকে নামির মুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। চিকিৎসক নামির পিতার দিকে চাহিয়া শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করিলেন।

জেনারেল নামির হাত দুখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"নামি, মা! শুনচ? আমি তোমার বাবা। আমরা সবাই এখানে রয়েচি।"

নামি উদাসনেত্রে চাহিল, একটু নড়িল, তারপর পিতার অশ্রুভরা চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল—"বাবা, অ বাবা! কেঁদো না বাবা!"

নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে নামি ডান হাতখানি ধীরে ধীরে উঠাইয়া পিতার হাত চাপিয়া ধরিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"মা?"

ভায়কাউণ্টেস নিকটে আসিয়া নামির অশ্রু মুছাইতে লাগিলেন। নামি তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল—"তবে চল্লুম মা!"

ভায়কাউণ্টেসের অধর কম্পিত হইল, তিনি একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রোরুদ্যমানা কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া কাতোগৃহিণী নিকটে আসিয়া নামির হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। কোমা আসিয়া দিদির শয্যার পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। শীর্ণ কম্পিত হাতখানি তুলিয়া নামি কোমার মাথার উপর স্থাপন করিয়া কহিল, "কোমা-চান, বিদায় ভাই"—

নামির নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছিল। কোমা তাহাকে এক চামচ মদ দিল। চোখ মেলিয়া নামি চারিদিক দেখিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিল—"কি-চান্—মি-চান্?"

শিশু দুটিকে গ্রীষ্মাবাসে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। নামি মাথা নাড়িল। তাহার চারিদিকে কি যে হইতেছে সে যেন তাহা কিছুই বুঝিতেছিল না। এমন সময় ইকু আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নামির শিথিল হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

নামি কহিল "ইকু—"

"দিদিমণি আমায় একলা ফেলে কোথায় যাও"—বলিয়া ইকু কাঁদিতে লাগিল।

বহুকষ্টে ইকুকে পাশের ঘরে পাঠানো হইল। আবার সব নিস্তব্ধ। নামি চোখ মুখ বন্ধ করিল। তাহার মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া নামিবার আর বিলম্ব নাই।

জেনারেল দ্বিতীয় বার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"নামি আর কিছু কি বলতে চাও? বল মা বল!"

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া নামি চক্ষু মেলিয়া মাসীমাতাকে দেখিতে পাইল। তিনি কহিলেন—"আমি তোমার জন্যে সব করব মা। কিছু ভেবো না। যাও মা! তোমার মার কাছে যাও!"

নামির অধরে একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। তারপর তাহার চক্ষু মুদিয়া গেল—তাহার সকল জ্বালার অবসান হইল।

স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক তাহার মৃত্যুপাণ্ডুর মুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। হাসিটি তখনো অধরে লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে ঘুম আর ভাঙিবে না!

*
* *

চারিমাসের অধিক উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শরতের আকাশে মেঘের লেশমাত্র নাই। অপরাহ্ণ সূর্য্যের আলোতে সমাধিভূমি প্লাবিত। চেরি গাছ হইতে একটি নীহারক্লিষ্ট পাতা নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল। বেড়ার গায়ে প্রস্ফুটিত ফুলগুলি বাতাস সুরভিত করিয়া তুলিতেছিল। ঝোপের মধ্যে কোথায় একটা পাখী ভয়ে ভয়ে চিরিক্ চিরিক্ করিয়া ডাকিতেছিল। কোণ্ডাইচো অভিমুখে একখানা রিক্স ছুটিয়া গেল, তাহার শব্দ যখন আর শোনা গেল না তখন স্থানটিতে পরিপূর্ণ

শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে কেবল সুদূর হইতে নগরের জীবন-কল্লোলের ক্ষীণ আভাস বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

একজন নৌ-কর্ম্মচারী কতকগুলি শ্বেত চন্দ্রমল্লিকা হাতে লইয়া আওয়ামার সমাধিভূমিতে প্রবেশ করিল। সে থামিয়া থামিয়া নূতন সমাধিস্তম্ভগুলির লেখা পড়িতে পড়িতে অগ্রসর হইতেছিল। এক স্থানে কতকগুলি সমাধি, তাহাদের চারিদিকে নীচু ঝোপ। কয়েকটি চেরি ও দেবদারু বৃক্ষ স্থানটিতে ছায়া বিস্তার করিতেছিল। সম্মুখে একটি পুরাতন প্রস্তর। তাহার পার্শ্বেই একটি নূতন সমাধি। একটি সুদর্শন দেবদারু উহার উপর চিরহরিৎ আচ্ছাদন রচনা করিয়াছে। রক্ত ও হরিদ্রা-বর্ণ চেরিপাতা উহার চতুর্দ্দিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। সমাধির উপর গাঢ়কৃষ্ণ কালিতে লেখা রহিয়াছে—"নামি-কাতাওকার সমাধি।" কর্ম্মচারিটি লেখা পড়িয়া প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সেখানে দাঁড়াইয়া সে বালকের ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

গতকল্য তাকেও ফর্ম্মোসা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

পাঁচ মাস পূর্ব্বে ফর্ম্মোসা যাইবার পথে ক্ষণেকের জন্য সে নামিকে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার পর কাতোগৃহিণীর পত্রে শুনিল—নামি আর ইহজগতে নাই।

সমাধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাকেওর জলভরা চোখের সামনে গত তিন বৎসরের স্মৃতিগুলি ভাসিয়া উঠিতেছিল। বিবাহের দিন, ইকাওএর সূর্য্যালোক, ফুদোমন্দিরের অঙ্গীকার, জুসির শেষ সন্ধ্যা এবং অবশেষে য়্যামাশিনায় ট্রেনে বসিয়া সেই চকিতের দেখা, একে একে সকল কথাই মনে পড়িতেছিল। একদিন সে বলিয়াছিল "শীগ্‌গির ফিরে এস"—সে কণ্ঠস্বর এখনো সেদিনকার মতই কানে বাজিতেছে, কিন্তু কোথায় সে!

তাকেও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল—"নামি আমার! কোথায় তুমি? এমনি করে' কি চলে' যেতে হয়!"

মাথার উপর দিয়া বাতাস বহিয়া গেল। সির সির করিয়া কতকগুলি চেরি পাতা সমাধির উপর ঝরিয়া পড়িল। তাকেওর চমক ভাঙিল। চোখ মুছিয়া সে সমাধির নিকট অগ্রসর হইল। ঝরা পাতা ও শুষ্ক ফুলগুলি পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া চন্দ্রমল্লিকাগুলি সেইখানে সাজাইয়া রাখিল। তারপর পকেট হইতে কি একটা বাহির করিল।

নামির শেষ পত্র। তাকেও পত্রখানি খুলিল। নামির সে সুন্দর হস্তাক্ষরের চিহ্নমাত্রও নাই। অক্ষরগুলা আঁকা বাঁকা, স্থানে স্থানে কালি লেপিয়া গিয়াছে, কাগজে অশ্রুচিহ্ন এখনো সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

সে লিখিয়াছিল—"আমার দিন শেষ হয়ে এসেচে তাই তোমায় কিছু বলে' যাচ্চি। এ জগতে তোমার দেখা পাবার আশা আমার মোটেই ছিল না, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তোমার সঙ্গে সে দিন দেখা হওয়ায় আমি যে কত সুখী হয়েছিলুম তা আর কি বলব। সেই এক মুহূর্ত্ত যে কেমন করে' কি করে' কাটাব তা ভেবেই পাই নি।"

তাকেও যেন পরিষ্কার দেখিতে পাইল, নামি ট্রেনের জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া অধীর আগ্রহে রুমাল নাড়িতেছে! তাকেও মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই, কেবল সম্মুখে সমাধির পাষাণস্তম্ভ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

"আমাদের সকল কল্পনা ব্যর্থ হয়েচে। তা হোক, তার জন্যে আমি কা'কেও দোষ দিই না। আমার ধূলার শরীর ধূলায় মিশলেও আত্মা আমার চিরদিন তোমার পাশে পাশে থাকবে—"

এমন সময় একটি বালক চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা বাবা কে রয়েচে দেখ!" সেই কণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিল "বাবা, তাকেও

সান”—কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ফুল হাতে লইয়া তাকেওর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিস্মিত তাকেও নামির পত্র হাতে লইয়া পিছনে দেখিল নামির পিতা দাঁড়াইয়া।

তাকেও সেদিকে আর চাহিতে পারিল না। মাথা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা কে আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে মুখ তুলিল।

দুজনে চোখোচোখি হইল। বৃদ্ধ জেনারেল বলিলেন—“তাকে. আমারও বুক ভেঙে গেছে!”

জগতে যে দুইজনকে নামি প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসিয়াছিল, তাহারা দিনান্তের অস্পষ্ট আলোকে দাঁড়াইয়া নামির সমাধি অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিল।

সমাপ্ত